ফুল ও ফল

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম এ কর্ত্তৃক।

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

---*---

কলিকাতা।

১৯নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, এ, বি, ঘোষ
এবং কোম্পানির যন্ত্রে,
শ্রী অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত
এবং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে
৫নং ভবনে শ্রীপ্রকাশনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন১২৯২ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসু অগ্রজ মহাশয়কে

ভক্তি এবং প্রীতির

চিহ্ন স্বরূপ

এই গ্রন্থ খানি দিলাম।

সেবক শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র।

ভূমিকা।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য পরিস্কার। ভগবান কি সে উদ্দেশ্য সফল করিবেন না!

গ্রন্থের সকল প্রবন্ধই বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কেবল আনুষঙ্গিক-কথা নামক প্রবন্ধটী প্রচার হইতে গৃহীত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কনে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

জেলা হুগলি।
কৈকালা।
১৪ই বৈশাখ ১২৯২।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

ফুল ও ফল।

ফুলের বৃন্ত।

(ধ্যান)

—o—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ স ভূমিং বিশ্বতোব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।

পুরুষ সূক্তম।

১

পৌষ মাস—বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল ঝক্‌মক্‌ করিতে করিতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। পর্ব্বত, নদ, নদী, গাছ, গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, ক্ষেত্র, পশু, পক্ষী, মনুষ্য—অনন্ত পৃথিবী সুমধুর সুকোমল ছায়া-মিশ্রিত সোণার রঙে রঞ্জিত। দূরে, উপরে—আকাশে কিছু ঘন ছায়া—যেন রাঙা মুখের উপর কৃষ্ণ কেশরাশি— যেন অনুরাগোৎফুল্ল প্রেমময়ীর বদনে সুমধুর সুগভীর বিষাদ রেখা। হর্ষ বিষাদের অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তি। পূর্ণ পুরুষের পূর্ণ মূর্ত্তি। আহা! পূর্ণ মূর্ত্তির কি শান্তিময়, কি কোমলতাময়, কি আনন্দময়, কি চিন্ময় গাম্ভীর্য্য!

সেই ম্রিয়মান সোণার পৃথিবীর উপর দিয়া, সেই গগন-প্রান্তস্থিত পরিবর্দ্ধনশীল ছায়ারাশির ছায়ায় একটু একটু মিশিয়া পাখী উড়িয়া যাইতেছে। ক্ষুৎপিপাসা মিটাইয়া

পাখিগুলি যেন সেই শান্ত সোণার রঙের মতন সোণার টুকুরা—মনের সুখে ভাসিয়া যাইতেছে—কিন্তু ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে,যেন সেই গগনব্যাপী ছায়ার ভিতরে ছায়া, যেন সেই শান্ত, সুন্দর, সুগভীর ছায়ার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া রহিয়াছে।

এখন ঐ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ও ঐ শান্ত, সুন্দর, সুগভীর গগনব্যাপী ছায়ার প্রাণে আপনার শান্ত, সুন্দর, সুগভীর প্রাণ মিশাইয়া দিল। গভীর প্রাণে গভীর প্রাণ মজিল—গভীর সমুদ্রে গভীর সমুদ্র মিশিল। ভারে সেই মিশ্রিত প্রাণরাশি বৃক্ষ, লতা, গৃহের উপরে ঢলিয়া পড়িল। স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী সেই শান্ত, সুগভীর, বিষণ্ণ প্রাণের শান্ত, সুকোমল নিশ্বাসে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। আমার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, দুইটি গাভী আর একটি গোবৎস রোমন্থন করিতেছিল। কি জানি কেন, তাহারা রোমন্থনে বিরত হইয়া, যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতেছিলাম। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া গ্রন্থখানি রাখিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে উঠিলাম। যেমন দাঁড়াইলাম, অমনি আমার প্রাঙ্গণস্থিত অশোক বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িল।

শুকাইলে সব খসিয়া পড়ে। তাই শুষ্ক অশোক পত্র খসিয়া পড়িল। কল্লোলিনীর কূলে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিব বলিয়া বাটীর বাহির হইলাম। বাটীর বাহিরে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। দেখিলাম, বটবৃক্ষের একটি কাঁচা পাতা খসিয়া পড়িল। দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম—এ কি! মনে হইল এ জগৎ ভৌতিক। তখন ভৌতিক জগৎ ভুলিয়া জগদ্বন্ধুর

ধ্যানে বসিলাম। ধ্যানান্তে শুষ্ক পত্র, কাঁচা পত্র কিছুই মনে নাই। গৃহে গেলাম। গৃহিণী বলিলেন সন্ধ্যা করিতে এত রাত্রি তোমার কখনও হয় নাই। আমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ধ্যানমগ্নের ন্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম।

২

প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে পর গৃহিণী আমার পদধূলি লইতে আসিলেন। কিন্তু আজ তাঁহাকে কেমন এক রকম দেখিলাম, তাঁহার শরীর যেন আলুথালু। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই। তবে এই মাত্র বলিলেন, কাল রাত্রি হইতে আমাকে সব কেমন কেমন বোধ হইতেছে, যেন সব এলাইয়া পড়িতেছে, যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম বোধ হইয়াছিল তাহাও যেন কত নরম হইয়া পড়িয়াছে। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দেখিলাম সর্ব্বত্র বৃক্ষের কাঁচা পাকা পাতা পড়িয়া রহিয়াছে, অনেকগুলি ছোট ছোট ডাল ও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দুই একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলকেই কিছু বিমর্ষ, কিছু বিস্ময়াপন্ন দেখিলাম—সকলেরই শরীর আলুথালু। সকলেরই যেন কিছু শ্বাস কষ্ট হইতেছে। সকলেই যেন আমাকে কিঞ্চিৎ কাতর ভাবে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। এক জন যাইতে যাইতে যেন ভাঙ্গিয়া- চূরিয়া বসিয়া পড়িল, আর এক জন অতি কষ্টে তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল।

৩

আমিও কিছু বিস্মিত হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যা-বন্দনাদি করণার্থ নদীতীরে যাইতেছি। যাইতে যাইতে দেখিলাম,

গাছের পাতা যেমন নিঃশব্দে পড়িয়া যায়, একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড শাখা তেমনি নিঃশব্দে খসিয়া পড়িল। আমি আরো বিস্মিত হইয়া দেবাদিদেবকে ডাকিলাম। মনে সাহস হইল। নদীতীরে গিয়া দেখি কল্লোলিনীর কায়া কিছু শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিঞ্চিৎ বিষন্ন ভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদি আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ একটা অতি কাতর, ক্ষীণ এবং মর্ম্মভেদী স্বর শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি একটা গাভী নদীতে জল পান করিতে আসিয়া নদী সৈকতে ডুবিয়া যাইতেছে, গোপালক তাহাকে টানিয়া তুলিতে গিয়া আপনিও ডুবিয়া যাইতেছে। আমি দ্রুতপদে গমন করিলাম ; কিন্তু যেমন সেখানে পৌছিলাম, অমনি গাভী এবং গোপালক উভয়েই সৈকতে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সূর্য্যের রশ্মি মলিন হইয়া উঠিয়াছে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম !

৪

পুনরায় আচমন করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিব বলিয়া নদীর জলে নামিলাম। জলে হাত দিলাম, হাতে জল লাগিল না ! তখন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যেখানে আমার হাত সেখানে জল নাই, সেখানে একটা শূন্য কূপ—একটা অতল-স্পর্শ শূন্য কূপ ! সেই কূপের পার্শ্বে খানিকটা জল, তাহার পর সেই রকম আর একটা অতলস্পর্শ শূন্য কূপ ! এই রূপ যত যাই, ততই দেখি খানিকটা জল আর এক একটা সেই রকম অতলস্পর্শ শূন্য কূপ—ঘোর অন্ধকার, কিন্তু ভিতর সমস্ত দেখা যায়, যতদূর দেখ দেখা যায়, দেখিয়া শেষ করা যায়

না—স্বচ্ছ অতলস্পর্শ অন্ধকার! এমন সুন্দর ভীষণ অন্ধকার কখন দেখি নাই।

আচমন করিয়া ধ্যানে বসিলাম। কিন্তু ধ্যানে আজ তাঁহাকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিলাম না। যত তাঁহার কাছে যাই, তত তিনি সরিয়া যান। বিষণ্ণ মনে উঠিয়া আসিলাম।

৫

সন্ধ্যা হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল। চাঁদের আলো নাই! চাঁদ যেন রাহুগ্রস্ত। আকাশে নক্ষত্র নাই। সমস্ত আকাশ নীহারময়। নীহার মলিন ও ম্রিয়মান!

প্রভাত হইল। সাবিত্রীকে প্রণাম করিব বলিয়া মাথা তুলিলাম। দেখিলাম—সূর্য্যমণ্ডল অর্দ্ধেক আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে—কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে প্রাণ নাই, সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতি নাই। এমন নির্জীব প্রভাত বিশ্বে বুঝি আর কখন হয় নাই!

ভাবিতে ভাবিতে আমার সেই কল্লোলিনীর কূলে গমন করিলাম। কল্লোলিনী শুকাইয়া রহিয়াছে! তাহার সেই স্বচ্ছ জীবনরাশি ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! সুন্দরীর শূন্য মলিন দেহ ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া আছে! আমার চক্ষু হইতে এক ফোটা জল পড়িল। চক্ষু পরিষ্কার হইল। দেখিলাম দূরে সে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ নাই। যেখানে গিরিশৃঙ্গ ছিল, সেখানে বিষণ্ন নীহারময় আকাশ!

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যমণ্ডল অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সেই অনন্তব্যাপী সূর্য্যমণ্ডল নিভিল! আরো নিভিল! আরো নিভিল! অনন্ত আকাশ হিম, আরো হিম, আরো হিম হইয়া উঠিল! অনন্ত আকাশ অন্ধকার-ময়, আরো অন্ধকারময়, আরো অন্ধকারময় হইল! অনন্ত দেশ শূন্য, আরো শূন্য, আরো শূন্য হইয়া গেল!

অনন্ত-গভীর অনন্ত-শূন্য অনন্ত অন্ধকার কণ্ কণ্ কণ্ কণ্ করিতে লাগিল।

৭

তখন দেখি—

সেই নীরব নিস্তব্ধ অনন্ত-গম্ভীর অনন্ত-শূন্য অনন্ত অন্ধ-কার ব্যাপিয়া একটা অন্ধকার-সদৃশ অনন্তকায় পক্ষী অনন্তের অনন্তগাম্ভীর্য্য ভরাইয়া, অনন্ত-শূন্য পূরাইয়া, অনন্ত-বৃহৎ স্বরে ডাকিতেছে —

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

আমার হৃৎকম্প হইল! কিন্তু সেই অনন্ত বৃহৎ স্বরের অনন্ত পূর্ণতায় মুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। ভয়ে কি মোহ! ভীষণ কি সুন্দর! পূর্ণ ভীষণতায় কি ভীম, কি ভরা সঙ্গীত! প্রলয়ের কি গভীর, কি ভয়ানক, কি গীতিময় প্রাণ!

আবার সেই অনন্ত-শূন্য পূরাইয়া, সেই অনন্ত-গাম্ভীর্য্য ভরাইয়া, সেই অনন্ত-বৃহৎস্বরে সেই অনন্তকায় পক্ষী—সেই অনন্ত-পক্ষ অনন্ত-চঞ্চু অনন্ত-দেহ ঘোর-কৃষ্ণ দাঁড়কাক—ডাকিল—

৭

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

আমার হৃৎকম্প হইল! আমি মুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

৮

স্তম্ভিত হইয়া ধ্যানে বসিলাম। ধ্যানে কিছুই দেখিলাম না, কিছুই পাইলাম না, কেবল শুনিলাম সেই অনন্ত-ভরা অনন্ত-পোরা অনন্ত-দীর্ঘ অনন্ত-প্রস্থ ডাক—

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

অনন্ত-হিম অনন্ত অন্ধকারে অনন্ত-দীর্ঘ অনন্ত-প্রস্থ অনন্ত-পোরা অনন্ত-ভরা ডাক—

ক-অ-অ! ক-অ-অ! ক-অ-অ!

৯

দুঃখে, বিস্ময়ে, রাগে আপনার আত্মাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহাও সুন্দর, কিন্তু ইহা অসার—এতকাল কি কেবল অসার—অসার সৌন্দর্য্য ধ্যান করিলাম? তখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলাম, সেই অনন্ত অন্ধকারে এক আঁধার-মাখান রক্তপদ্ম হাসিতে হাসিতে ঘুমাইতেছে, সেই হাসির ছটা—এক অপূর্ব্ব অমৃতময় নীল আভা—সেই অনন্ত অন্ধকারে আভাস-মাত্রায় ফুটিয়াছে। আর দেখিলাম সেই ঘোর-কৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী সেই নীলাভ অন্ধকারে একটু ডুবিয়াছে, তাহার সেই অনন্ত-ভরা ডাক একটু নামিয়াছে, একটু কমিয়াছে, একটু ডুবিয়াছে।

অনন্ত অন্ধকারে সেই নীল আভা একটু ঘন, একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই ঘোর-কৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী আরো একটু

ডুবিল—অনন্তকায় পক্ষীর অনন্ত-ভরা ডাক আরো একটু নামিল, আরো একটু কমিল, আরো একটু ডুবিল।

অনন্ত অন্ধকারে সেই নীল আভা যত ঘন, যত উজ্জ্বল হইতে লাগিল, সেই ঘোর-কৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী তত ডুবিতে লাগিল,অনন্তকায় পক্ষীর অনন্তভরা ডাক তত নামিতে লাগিল, তত কমিতে লাগিল, তত ডুবিতে লাগিল। নামিয়া নামিয়া, কমিয়া কমিয়া, ডুবিয়া ডুবিয়া সেই অনন্তভরা ডাক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া আসিল—যেন সেই ডাক তাহার অনন্তকায়া এবং অনন্তরাজ্য হারাইয়া অনন্ত-দূর হইতে আসিতে লাগিল।

সেই অনন্তদূর হইতে আগত অনন্তক্ষীণ ডাক শুনিয়া ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইল!

যে অনন্তকায় পক্ষীর সেই অনন্তভরা ডাক, সে কি হইল, কোথায় গেল, বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার সেই অনন্তভরা ডাক এখন অনন্তক্ষীণ আকারে অনন্ত-দূর হইতে আসিতেছে দেখিয়া, ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইল! সেই অনন্ত-দূর হইতে আগত অনন্তক্ষীণ ডাকের ন্যায় ভীষণতায় অনন্ত শক্তির ও হৃৎকম্প হয়। সে ভীষণতা ভীষণতাভরা। সে ভীষণতায় ভীষণতা বই আর কিছুই নাই!

১০

সেই অনন্ত অন্ধকার গভীর নীলিমাময় হইল। তখন সপ্নান্তরের ন্যায় সহসা সেই অনন্ত নীলিমাসমুদ্র এক অপূর্ব্ব নীলিমাময় আকার ধারণ করিল—দুই পদ,চারি বাহু, অনতিদীর্ঘ দেহ, অতুল মুখমণ্ডল, অনির্ব্বচনীয় কান্তি, চারি হাতে শঙ্খ চক্র

গদা পদ্ম বিশিষ্ট আকার ধারণ করিল। আকার শান্ত, গম্ভীর, সংযত, সুন্দর। সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় অনতিদীর্ঘ দেহ সমস্ত দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রহিয়াছে। আর সেই অনতিদীর্ঘ দেহের মধ্য হইতে, সেই ভীষণ অনন্তক্ষীণ ক-অ-অ, ক-অ-অ ধ্বনি নির্গত হইতেছে—বোধ হইতেছে যেন ধ্বনি অনন্ত যোজন দূর হইতে আসিতেছে।

যে দিকে চাই, সেই দিকেই সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় অনতিদীর্ঘ পদ্ম-পলাশ-লোচন পুরুষ সমস্ত দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রহিয়াছেন—তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহের মধ্য হইতে সেই ভীষণ অনন্তক্ষীণ ক-অ-অ, ক-অ-অ ধ্বনি নির্গত হইতেছে,—বোধ হইতেছে যেন ধ্বনি অনন্ত যোজন দূরে উত্থিত হই-তেছে।

সম্মুখে পশ্চাতে নীচে উপরে পার্শ্বে কেবল মাত্র সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় নীলাভ অনতিদীর্ঘ পদ্ম-পলাশ-লোচন মহা-পুরুষ অনন্ত দৃষ্টিপথ যুড়িয়া রহিয়াছেন—তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহের মধ্য হইতে সেই ভীষণ অনন্তক্ষীণ ক-অ-অ, ক-অ-অ ধ্বনি নির্গত হইতেছে—বোধ হইতেছে যেন, যে ঘোরকৃষ্ণ অনন্তকায় পক্ষী সেই ক-অ-অ ক-অ-অ ধ্বনি করিতেছে, সে সেই অনতিদীর্ঘ দেহের ভিতরে, কে বলিবে কোথায়, অনন্ত যোজন দূরে পড়িয়া আছে।

১১

ভয়ে, বিস্ময়ে, আহ্লাদে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি দেখিতেছি? ইহা ত প্রলয় নয়—যাঁহাকে দেখিতেছি, তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহের ভিতরে, কে বলিবে

কোথায়, অনন্ত যোজন দূরে প্রলয় পড়িয়া রহিয়াছে। তবে এ কি দেখিতেছি?

তখন শুনিলাম, সেই অপূর্ব্ব নীলিমাময় নীলাভ অনতিদীর্ঘ অনন্তব্যাপী পদ্মপলাশলোচন মহাপুরুষ কণ্ঠস্বরে অনন্ত ভরাইয়া অনন্ত পূরাইয়া অনন্ত জাগাইয়া অনন্ত কাঁপাইয়া অনন্ত মাতাইয়া বলিলেনঃ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

এই অপূর্ব্ব স্ফোট্ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপে ফাটিয়া পড়িল—অমনি অনন্ত চরাচর নতশীরে সেই অন্তর্হিত মহাপুরুষের স্তুতি গান করিতে আরম্ভ করিল। অনন্ত বিশ্ব আহ্লাদে ভাসিল দেখিয়া আমিও আমার সেই কল্লোলিনীর কূলে যজ্ঞেশ্বরের ধ্যানে বসিলাম। ধ্যানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পার হইয়া দেখিলাম সেই অপূর্ব্ব রক্তপদ্ম স্বপ্নসুখে ভাসিতেছে। আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম।

ফুল।

(কোকিল)

পৃথিবীতে দুঃখ এবং দুর্নামের ভাগই বেশী। মনুষ্যের ইতিহাসে ওয়াশিংটনের সংখ্যা খুব কম; অতিলা এবং জঙ্গিসের সংখ্যা খুব বেশী। কথাটা খারাপ বটে, কিন্তু ইহাতে রাগ বা বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে পৃথিবী প্রবল হইবারই কথা, স্বর্গ সর্ব্বদা কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে? তবে যে স্বর্গও দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল পৃথিবীর উপর আকাশ আছে বলিয়া। উপরে আকাশ না থাকিলে কাল জলে আলো খেলিত না। অতএব পৃথিবীতে যে এত লোক অপযশের ভাগী বলিয়া আপন আপন অদৃষ্টের দোষ দেয় সে বড় একটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কেহ কেহ আছে যাহারা অনেক গুণের অধিকারী হইয়াও লোকের কাছে যথেষ্টরূপে পরিচিত নয়, যাহাদিগকে লোকে জানে কিন্তু চিনে না। তাহাদেরই যথার্থ দুরদৃষ্ট। তাহাদের মধ্যে কোকিল প্রধান।

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেননা কোকিল কাল। এ কথা স্বীকার করি যে নানারঙেরঞ্জিত সুকোমলপক্ষবিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব জ্যোতি, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কান্তি,অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। তাহাদের কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া বালক ভুলে, কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবা ভুলে, কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া বৃদ্ধ ভুলে। কোকিল কাল—অতএব কোকিলের সে রকম সৌন্দর্য্য নাই। কিন্তু কাল বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত? কাল জল সুন্দর, কাল মেঘ সুন্দর, কাল চুল সুন্দর।

তবে কাল কোকিল সুন্দর নয় কেন? তুমি বলিবে:—কেন তা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, তাই বলি কাল কোকিল কুৎসিত। আমি বলি,—তুমি নিজে কুৎসিত, সৌন্দর্য্য দেখিতে জান না, তাই কাল কোকিলকে কুৎসিত দেখ। দেখ, কাল জল কাল বলিয়া সুন্দর নয়, তাহা হইলে এই যে কাল কালিতে লিখিতেছি ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কাল জলে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কাল জল সুন্দর। তেমনি কাল মেঘ অমৃতবৎ বারি বর্ষণ করিয়া কাল জলের সহিত কথা কয় বলিয়া, অর্থাৎ কালকে ভালবাসে বলিয়া সুন্দর। আর কাল চুল সুন্দরী সতীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। কাল বলিয়া ভাল কেহই নয়। ভাল-র সম্পর্কে থাকিয়াই কাল ভাল। কৃষ্ণ মোহিনীশক্তিরূপী বলিয়াই গোপকন্যারা তাঁহার কাল রূপে এত মুগ্ধ। ছেলে নাড়িছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কাল রঙ এত সুন্দর। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটী প্রধান সূত্র এই—যাহা মনের সহিত গাঁথা, মন তাহার দোষ টুকুতেই বেশী গুণ দেখে, তাহার যে টুকু কম সুন্দর সেই টুকুতেই বেশী সৌন্দর্য্য দেখে। যাহা সুন্দর নয় তাহাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। যাহা সুন্দর নয় তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর করে তাহাই সৌন্দর্য্য বোধের প্রকৃত ইন্দ্রিয়, কেন না তাহা জগতের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব সদ্ভাব সংস্থাপন করে—জগতের কদর্য্যতা নাশ করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সে ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, মন অথবা হৃদয়। কাল কোকিলের কি এমন কিছুই নাই যাহার গুণে তাহাকে কুৎ-সিত না দেখিয়া সুন্দর দেখি? তুমি বলিবে—কিছুই ত নাই, তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন? আমিও এই কথার একটা মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

অনেক দিনাবধি কোকিল কবিদিগের সম্পত্তি। তাঁহারা কোকিলকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলকে চিনিতে পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখী। তাঁহারা কোকিলের কণ্ঠে একরাশি বিরহের বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে একটা বিষম হাড়জ্বালানে জন্তু করিয়া তুলিয়াছেন। আর সেই জন্যই আজকাল বঙ্গীয়

নব্য কবিদিগের মধ্যে যিনি কোকিলের নাম করেন তাঁহার ভাগ্যে বিধাতা উপহাস ভিন্ন আর কিছুই লেখেন না। ইহা নব্য কবির দুরদৃষ্ট নয়; কোকিলের দুরদৃষ্ট। কবিরা বলেন যে কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই—যে মধু আছে সেও বিষমাখা। কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহ-কাতরতা বৃদ্ধি হয় অথবা আসঙ্গলিপ্সার উদ্রেক হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। এ কথা সত্য কি না আমি জানি না। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বই কি আর কিছুই নাই? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতঃউৎপন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে? খলতাশূন্য, গ্লানিশূন্য, সরল, নির্ম্মল, সুকোমল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া শেষ নিশিতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কু-উ করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে আর তাহাকে ধরে কে? কোকিলের স্বরে বিষ কৈ? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে ফুটাইয়া দিল; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিত দিঙ্‌মণ্ডলকে হাসাইয়া তুলিল; সমস্ত শিরায় রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল; সর্ব্ব শরীরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ তড়িৎ হানিল। কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্বর্গীয় ঐন্দ্রজালিকের নিশ্বাস! আবার বালককে ছাড়িয়া বাল সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগনপ্রান্ত ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিতভাবে একটু একটু করিয়া অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্‌খাস্‌ করিতেছে। ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কাণের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধ-কণ্ঠে 'আব্' 'হাম্' এইরূপ একটা শব্দ করিল। নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু একটু করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল পড়িল—তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতর একটু একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিল ফুটিল বোধ হইতেছে।

এমন সময় যেন সমস্ত ফোটনোন্মুখী পৃথিবী খানা কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল, আর একেবারে বনে পাখী পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্ব্ব দিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারি দিক্ ফরসা হইয়া গেল। কাল কোকিল ব্রহ্মাণ্ডটাকে ফুটাইয়া দিল। কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব্ব সঙ্গীত কোকিলের কাল কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়! কোকিলের সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতঃউৎপন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনি কেহ কখন বুঝিয়াছে কি* ?

অসার, পরান্নভোজী, সদ্যসুখপ্রিয় চাটুকারকে লোকে 'বসন্তের কোকিল' বলিয়া গালি দেয়। লোকে কোকিলকে বুঝে না বলিয়াই এই রূপ গালি দেয়। এটা কোকিলের দুরদৃষ্ট নয় ত কি? বসন্তে কাননের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে! শীতের কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের নবীন আলোকে চারিদিক্ ফুট্ ফুট্ করিতেছে। বিমল আকাশে কাননটি বেড়িয়া বেড়িয়া ছোট ছোট পাখীগুলি উড়িয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী সজীব দুর্ব্বাদলে আবৃত। তদুপরি নানাবর্ণ শোভিত পতঙ্গ আনন্দে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষলতা নূতন সাজে সাজিয়া সরোবরের স্বচ্ছ জলের সহিত সদালাপ করিতেছে। নীলোজ্জ্বল আকাশ সমস্ত কাননটিকে অমৃতময় আলিঙ্গনে ধরিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, আলো, জল, আকাশ, পৃথিবী—সব ফুটিয়াছে। ফুটিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত হর্ষ, এই সমস্ত উল্লাস, এই সমস্ত স্ফোট—আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমস্ত সঙ্গীতময় স্ফূর্ত্তি কি জানি কোথাকার কোকিলের প্রাণে

---

* অধ্যাপক Monier Williams বিলাতী nightingale-এর সহিত তুলনা করিয়া আমাদের কোকিলের নিন্দা করিয়াছেন। আমি কখনও বিলাতেও যাই নাই, nightingale-এর গানও শুনি নাই। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে Monier Williams কখনও কোকিলের স্বর যাহাকে প্রকৃত শুনা বলে তেমন করিয়া শুনেন নাই। যদি তেমন করিয়া শুনিতেন তাহা হইলে তাহার নিন্দা করিতে পারিতেন না। যে স্বরে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট এবং স্ফূর্ত্তি ধ্বনিত হয়, সে স্বর কি তুলনায় হারে? না তাহার অপেক্ষা বড় স্বর থাকা সম্ভব?

প্রবেশ করিয়া ঐ কু-উ স্বরে অপূর্ব্বতানে নির্গত হইতেছে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, আকাশ, পৃথিবী,—আজিকার অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব, উন্নত, পূর্ণবিকশিত প্রাণ ঐ তরঙ্গিনী-তরঙ্গ সদৃশ কু-উ ধ্বনিতে নির্গত হইতেছে—গলিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আজ বসন্ত—আজ জগতের এক দিন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত—পৃথিবী পর্য্যায়ক্রমে এই কয়টি ঋতু ভোগ করিয়াছে। এই কয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর উপাদানে যে সকল গূঢ় পরিবর্ত্তন করিয়াছে বসন্ত ঋতু তাহার চরম ফল—পৃথিবীর প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করিয়াছে বসন্ত ঋতু তাহার পরম পদার্থ। দশ মাস ধরিয়া পৃথিবী আজিকার অপূর্ব্ব বিকাশের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল। আজ সেই গতি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই চরম সীমা অথবা সেই চরম বিকাশের নাম বসন্ত। বসন্তের কোকিলের কণ্ঠ হইতে সেই চরম বিকাশ স্বররূপে নির্গত হইতেছে। বসন্তের কোকিল নিন্দার পাত্র নয়। বসন্তের কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি—অপূর্ব্ব বিকাশের অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনী! কোকিল জগতের চরম স্ফূর্ত্তির গীত গায় বলিয়া জগতের চরমবিকাশরূপ বসন্তের পাখী। জগতে যত কিছু অপূর্ব্ব স্ফোট, অপূর্ব্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা, হোমরের ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ গর্দন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, ব্রহ্মগুরূপী ব্যাস—সকলই কএ অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। বসন্তের কোকিল! তুমি বিকাশ গীত গাও, উন্নতির সঙ্গীত শুনাও, তথাপি তোমাকে কেহ এপর্য্যন্ত চিনিল না। ভারতবাসী তোমাকে যে দিন চিনিবে, যে দিন তোমার অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনির মর্ম্ম বুঝিবে এবং মর্ম্মে মজিবে, সেই দিন ভারতের উন্নতির সূত্রপাত হইবে, জীবন-সঙ্গীতের প্রথম তান শুনা যাইবে। একতানাত্মক শারীরিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ কাহাকে বলে * ভারতবাসী সেই দিন বুঝিয়া তাহার অতুল সৌন্দর্য্য অধিকার করিবার জন্য

* বঙ্কিম বাবু এখন নবজীবনে তাহাই বুঝাইতেছেন।

উন্মত্ত হইবে। সেই দিন বসন্তের কোকিলকে নিন্দা না করিয়া ভারতবাসী বসন্তের কোকিল হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। বসন্তের কোকিলকে কেহ কখন বুঝিয়াছে কি?

আবার কোকিলের একটা পঞ্চম আছে। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময় বনের ভিতর একটা কু-উর উপর আর একটা কু-উ চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু-উ আরো চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু-উ আরো চড়িয়া উঠিল, শেষে আরো কত চড়িয়া উঠিল ঠিক করিতে পারিলাম না। শিশুর পর বালক, বালকের পর যুবা, যুবার পর পূর্ণ মনুষ্য। বায়ুর পর অগ্নি, অগ্নির পর জল, জলের পর জমি, জমির পর মৎস্য, মৎস্যের পর সরীসৃপ, সরীসৃপের পর পশু, পশুর পর মনুষ্য। উন্নতির উপর উন্নতি, তার উপর আরো উন্নতি, তার উপর আরো উন্নতি। বিকাশের পর বিকাশ, তার পর আরো বিকাশ, তার পর আরো বিকাশ। ক্ষুদ্র জগতের উপর বড় জগৎ, তার উপর আরো বড় জগৎ, তার উপর আরো বড় জগৎ। ইহাই কোকিলের পঞ্চস্বরে ব্যক্ত হইতেছে, সুমধুর শব্দে ধ্বনিত হইতেছে, অপূর্ব্ব সঙ্গীতরূপে নিনাদিত হইতেছে। উন্নতির পর উন্নতি, বিকাশের পর বিকাশ—ইহাই ত সঙ্গীতের তানের-উপর-তান—সে তানের-উপর-তান কোকিলের পঞ্চম ভিন্ন আর কোথাও শুনা যায় না। কোকিলের পঞ্চম কে কবে বুঝিয়াছে? কোকিলের পঞ্চমের মর্ম্মে মজিতে না পারিলে ভারতের উন্নতির পর উন্নতি, তার পর আরো উন্নতি, শেষে মনুষ্যের প্রাপ্য চরম উন্নতি কখনই হইবে না। প্রার্থনা করি ভারত যেন কোকিলের ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীতময় কল্পনার ন্যায়, পঞ্চমে উঠিতে সক্ষম হয়। প্রার্থনা করি আমাদের কোকিলকে যেন আমরা চিনিতে পারি। আমরা যেন কোকিলের পঞ্চমের ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমে ফুটিয়া উঠি। আমরা যেন সেই সতেজ সুমধুর গগনভেদী পঞ্চমের ন্যায় জগৎভরা সঙ্গীত হইয়া পড়ি।

নগরে কেহ কোকিলের কু-উ ধ্বনি শুনিয়াছ? প্রকাণ্ড জনপদ—বিস্তীর্ণ রাজধানী। রাজধানীতে অসংখ্য পল্লী; প্রত্যেক পল্লীতে অসংখ্য রাজবর্ত্ম; প্রত্যেক রাজবর্ত্মে অসংখ্য বাড়ী; প্রত্যেক বাড়ীতে অসংখ্য মনুষ্য।

নগর কোলাহলে পূর্ণ। অসংখ্য গাড়ি ঘর্ঘরশব্দে চলিয়া যাইতেছে; অসংখ্য অশ্ব হ্রেষারব করিতেছে; অসংখ্য কল বিষম শব্দে মানুষের কাণে তালা লাগাইয়া দিতেছে। পথে ভিখারী ভিক্ষা মাগিতেছে; পণ্যবিক্রেতা চীৎকার করিতেছে; যানবাহকেরা বিষম শব্দ করিতেছে; কেহ বা গান ধরিয়া উঠিতেছে। কোথাও বালক কাঁদিতেছে, প্রহরী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, শববাহক হরি হরি ধ্বনি করিতেছে। মানুষ গাড়ির উপর পড়িতেছে, গাড়ি মানুষের উপর পড়িতেছে, মানুষ মানুষের উপর পড়িতেছে। সমস্তই কোলাহল, সমস্তই গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খলা, সমস্তই অনিয়ম—কবির Chaos! এই Chaos, এই গোলমাল, এই বিশৃঙ্খলতার ভিতর কি শুনিলাম?—কু-উ! এখন বুঝিলাম ও কু-উ কি। অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে; চারিদিকে উল্কাপাত হইতেছে; সহসা ধূমকেতু দেখা দিতেছে, সহসা কোথায় চলিয়া যাইতেছে; সহসা নক্ষত্র নিভিতেছে, সহসা খসিয়া পড়িতেছে;—কি বিশাল বিশৃঙ্খলতা! রাজা ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজা হইতেছে, প্রেমিক পিশাচ হইতেছে, পিশাচ প্রেমিক হইতেছে, দুরাত্মা মহাত্মা হইতেছে, মহাত্মা দুরাত্মা হইতেছে—কি বিষম রহস্য! কি বিকট বিশৃঙ্খলতা! পর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিতেছে, সমুদ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, জনপদ অরণ্য হইয়া যাইতেছে, অরণ্য জনপদে পরিণত হইতেছে, এক প্রকার জীব অদৃশ্য হইতেছে, আর এক প্রকার জীব দৃষ্টিপথে আসিতেছে! কিছুই বুঝা যায় না, যেন সব গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খল। কিন্তু ঐ বিশৃঙ্খলতাময় নগরের কোলাহলভেদী কু-উ ধ্বনি এই ভাবে মন ভরাইয়া দিতেছে যে, বিশ্বের সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মূলে ঐরূপ একটী কু-উ ধ্বনি আছে, যাহা অনিয়ম বলিয়া অবাক্ হইয়া দেখি তাহার অন্তরালে ঐ অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনির ন্যায় একটী অমৃতময় সঙ্গীতধ্বনি অবিরত ধ্বনিত হইতেছে, প্রলয়ের তুফানের তলে মধ্য রাত্রির সুগভীর শান্তির সমতানে সুমধুর কু-উ ধ্বনি হইতেছে। যে সঙ্গীত, যে কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিলে মানুষের মন, মানুষের আত্মা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, নগরবাসী কোকিলের কণ্ঠ হইতে সেই সঙ্গীত, সেই কবিত্ব নিঃসৃত হইতেছে। কোকিলের কু-উ স্বরে বিরহের বিষ নাই—উহাতে কেবল ব্রহ্মাণ্ডের কবিত্ব-মূলক

রহস্যের অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি আছে। কোকিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মরূপ সঙ্গীত বা কবিত্বের কাল কবি। অতএব ভারতসন্তানগণ! কোকিলের কাছে দীক্ষিত হও। কোকিল তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের আর কিছু বুঝিতে পার আর নাই পার, ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিও, নহিলে তোমরা মানুষ হইবে না, বিশৃঙ্খল হইয়া বিনষ্ট হইবে। কোকিল তোমাদিগকে ইহাও শিক্ষা দিতেছে যে তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর বিষম বিশৃঙ্খলতা আছে, কিন্তু সে বিশৃঙ্খলতার মূলেও অপূর্ব্ব সঙ্গীত বা কবিত্ব আছে। তোমরা যখন সেই বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত বা কবিত্বে তোমাদের সমস্ত দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি পূরাইতে পারিবে, তখনই তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের স্ফূর্ত্তি (Culture) সম্পূর্ণ হইবে—তোমরা মানুষ হইবে, তার আগে নয়। বসন্তের হাড়্জ্বালানে কুৎসিত কোকিলকে গুরু করিয়া তাহার শিষ্য হইতে পারিবে না কি? কাল কোকিল যে কবিত্বের কবি তোমরাও কি সেই কবিত্বের কবি হইতে পারিবে না? না বলিও না, তাহা হইলে তোমাদের বংশমর্য্যাদা বিলুপ্ত হইবে। ব্যাস-বাল্মীকিরূপ কু-উ ধ্বনির প্রতিধ্বনি বলিয়া কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।

ফল।

(অদৃষ্ট)

ভারত অদৃষ্টবাদের চিরপ্রসিদ্ধ ভূমি। অদৃষ্টবাদিত্ব ভারতবাসীর ধাতুগত প্রকৃতি। সেকেলে লোকের ত কথাই নাই। এখন যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারাও, কথায় না হউক কাজে, জ্ঞাতসারে না হউক অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক না হউক অনিচ্ছাপূর্ব্বক, অদৃষ্টবাদী। আমি অদৃষ্টবাদে যত দর্শন দেখি, তদপেক্ষা কবিত্ব দেখি; যত জ্ঞান দেখি তদপেক্ষা ভাব দেখি; যত চিন্তার জিনিস দেখি তদপেক্ষা কর্ম্মের সূত্র দেখি। কথাটা কিছু বিস্ময়কর, কিছু নূতন রকমের, কিন্তু বুঝিয়া দেখিবার মতন। মানুষের সুখ দুঃখের কারণ সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে বলেন সুখদুঃখ কর্ম্মফল মাত্র এবং কর্ম্মফলের নামই অদৃষ্ট। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে কর্ম্মের অর্থ নিজ নিজ রুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি এবং বিবেচনা মূলক কর্ম্ম। তাই তাঁহারা কর্ম্মফলের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে, যাঁহার কর্ম্ম কেবল তাঁহারই রুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি এবং বিবেচনার দোষগুণ বিচার করিয়া থাকেন। তাহাই যদি প্রকৃত পদ্ধতি হয় তবে অদৃষ্ট বড় ভাল জিনিস নয়। অন্ধ যদি সেই অর্থে শুধু নিজ কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়া থাকে তবে কেন আমি তাহার দুঃখে দুঃখিত হই? কিন্তু যখন শুনি লোকে বলিতেছে, এই অন্ধের কি অদৃষ্ট!—তখন অদৃষ্টে সে রকম কর্ম্মফল দেখিতে পাই না। তখন অদৃষ্টে জগতের দুর্ভেদ্য দুঃখ-রহস্য দেখিতে পাই, মানুষকে কি-জানি-কাহার, কি-জানি-কিসের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া অনুভূত করিয়া কাতর হই—তখন মানুষকে এক অসাধারণ অতলস্পর্শ কবিত্বের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়—সেকন্দর বাদশাহ যেমন হোমর পড়িয়া বীরমদে মত্ত হইয়া উঠিতেন, তখন তেমনি সেই

অদ্ভুত কবিত্বে মজিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে প্রধাবিত হই। এ অদৃষ্ট যদি অলীক হয় তবে জানিব যে, অলীক মনুষ্যের অলীকত্বের প্রয়োজন আছে।

কথাটা আরো একটু বুঝাইবার চেষ্টা করি। বুঝান বড় কঠিন, কিন্তু চেষ্টা করি। দুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়, ইহা মনুষ্যের প্রকৃতি—মানব হৃদয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু এই প্রকৃতি, এই ধর্ম্মের মূলে শিক্ষা আছে। তাহার প্রমাণ—অসভ্য মনুষ্য। দুঃখ দেখিলে অসভ্য মনুষ্যের হৃদয় গলে না। মানুষ যত সভ্য হয়, ততই দুঃখ দেখিলে দুঃখিত হয়। অথবা দুঃখ দেখিয়া মানুষ যত দুঃখিত হয়, তত সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। কোম্‌তের মতে egoistic প্রবৃত্তির দমন এবং altruistic প্রবৃত্তির প্রাধান্য লাভের নামই সভ্যতা। সভ্যতার অর্থ শিক্ষা, অতএব দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হওয়ার অর্থও শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ—মনের সহিত বাহ্যশক্তির সংযোজনা। সেই সংযোজনার সম্পূর্ণতায় শিক্ষার সম্পূর্ণতা এবং সভ্যতার সম্পূর্ণতা। অদৃষ্টবাদ কি শিক্ষার অন্তর্গত নয়? মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্যকে দুঃখে দুঃখিত করে। কিন্তু বুদ্ধি অনেক সময়ে হৃদয়ের প্রতিকূল হইয়া থাকে। ভারতের আধুনিক কর্ম্মফলবাদীরা অনেক সময়ে দরিদ্র এবং আতুরদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন। ইউরোপের আধুনিক কর্ম্মফলবাদীরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু দুঃখ ত দুঃখ বটে। যে কারণেই হইয়া থাকুক, দুঃখ ত দূর করা চাই, নহিলে দুঃখ যে বাড়িয়া যায় এবং দুঃখ বাড়িয়া গেলে মনের সহিত বাহ্য জগতের সংযোজনা যে কমিয়া যায়, সামঞ্জস্য যে বিনষ্ট হয়। সে সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে জগতে যে মনের স্থান থাকিতে পারে না, মন যে প্রলাপময় হইয়া উঠে। আজ ইউরোপে এবং নূতন ভারতে মন যে তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। আবার বল দেখি, যদি দুঃখ আর দুরদৃষ্ট এক বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে দুঃখে দুঃখিত না হইয়া কি থাকা যায়? মানুষকে এক অচিন্ত্যনীয়, অপরিমেয় শক্তির অথবা শক্তি-সমষ্টির, এক অপূর্ব্ব অতলস্পর্শ কবিত্বের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া ভাবিলে, মানুষের দুঃখে না কাঁদিয়া, মানুষের দুঃখ না মোচন করিয়া কি থাকা যায়? খেল্‌না ভাঙ্গিলে বালকের কান্নার কি সীমা থাকে? অদৃষ্টবাদী না হইলে মানুষ কি মানুষের জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে পারে?

তুমি হয় ত বলিবে যে, আমি যে অর্থে অদৃষ্ট শব্দ ব্যবহার করিতেছি তাহা অলীকই মাত্র। কিন্তু অদৃষ্ট যে অলীক, তাই বা কেমন করিয়া বলি ? মানুষের সুখ দুঃখের সমস্ত কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি ? মানুষ শত সহস্র শক্তি পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র—শত সহস্র শক্তি সম্ভূত একটী ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অসংখ্য বাহ্যশক্তির সহিত সম্পর্কবদ্ধ, কিন্তু তাহার জ্ঞান অল্প, কত শক্তি এবং কি প্রকারের শক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক তাহা সে জানে না, জানিবার তাহার উপায়ও অল্প। আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান এ কথা মানে, কিন্তু মানিয়াও ইহার ধ্যান করিতে পারে না। এবং সেই জন্যই আধুনিক ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রে Survival of the fittest প্রভৃতি নৃশংস মতের প্রাদুর্ভাব। আধুনিক Evolution মতানুসারে আজিকার মনুষ্য জগতের বিকাশাবধি যত যুগ অতীত হইয়াছে সেই সমস্ত যুগের ফল বা সৃষ্টি বই নয়। কিন্তু কে কবে সেই সকল যুগ বুঝিয়াছে বা বুঝিবে ? এবং আজিকার মনুষ্যকেই বা কে কেমন করিয়া বুঝিবে ? তবেই বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান এবং দর্শনানুসারে মানুষে অদৃষ্ট আছে। তথাপি Evolution মতাবলম্বী দার্শনিকেরা যখন মানুষের সুখ দুঃখের কথা বলেন তখন কেবল তাহার নিজের কর্ম্মের দোষগুণ নির্ণয় করিয়া সমাজকে শিক্ষা দেন এবং রাজপুরুষদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন। তখন তাঁহারা আজিকার মানুষে আজিকার মানুষ বই আর কিছুই দেখিতে পান না। তখন তাঁহাদের মতে জগতে কিছুই অদৃষ্ট থাকে না। ইহার অর্থ এই যে, ইউরোপীয়েরা মানুষকে পড়িতে পারেন, কিন্তু ধ্যান করিতে পারেন না। পদার্থ বিজ্ঞানের শাসনেই হউক আর তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতির গুণেই হউক, তাঁহারা কোন বিষয়েই 'দুই-দু-গুণে চারি' এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি তাঁহাদের কবিবর Tennyson যিনি De Profundis লিখিয়াছেন, বোধ হয় তিনিও সংসারক্ষেত্রে 'দুই-দু-গুণে চারি' প্রণালী অতিক্রম করিতে পারেন না এবং দুরদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট কিছুই বুঝেন না। পুরাকালে দুইটী অসাধারণ প্রতিভাশালী জাতি অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—গ্রীক এবং হিন্দু। কিন্তু দুইটী জাতির অদৃষ্ট ভিন্ন রকমের। হিন্দু অদৃষ্টে যুগ যুগান্তরনিহিত আছে, কোটি কোটি কর্ম্মফল নিহিত আছে ; জল, বায়ু,

পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অসীম বিশ্ব নিহিত আছে। সে অদৃষ্টের আকার নাই, মূর্ত্তি নাই---কিন্তু ধ্যান আছে। সে অদৃষ্ট ব্যক্তি নয়, বিষয়। সে অদৃষ্টের নাম অনাদি ইতিহাস—অনন্ত অসীম ব্রহ্ম। সকলি সে অদৃষ্টে আছে; সে অদৃষ্ট সকলেতেই আছে। সে অদৃষ্ট শুভ এবং অশুভ, দুইই। 'দুই-দু-গুণে চারি' যেমন করিয়া বুঝি, সে অদৃষ্ট তেমন করিয়া বুঝি না বটে; কিন্তু ধ্যানে জানি সেও 'দুই-দু-গুণে চারি'। এবং সেই জন্যই তাহাকে অতলস্পর্শ কবিত্ব বলি। যে মহাতত্ত্বের মূলে জ্ঞান আছে, কিন্তু যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, ধ্যানে পাওয়া যায়, তাহাকেই প্রকৃত কবিত্ব বলে। গ্রীক অদৃষ্টের সীমা আছে—দুঃখ তাহার অন্তর্গত, সুখ নয়। গ্রীক-মন সঙ্কীর্ণায়তন, হিন্দুর ন্যায় অসীম, অনিশ্চিত এবং অনির্দ্দিষ্টের ধ্যান করিতে পারিত না। তাই সে মনে অদৃষ্ট সীমাবদ্ধ এবং রুদ্রমূর্ত্তি। সে কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রীক কাঁদিত এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যাইত। সে মূর্ত্তির কাছে গ্রীক মন্ত্রাহতের ন্যায়—ভয়ে বা শোকে এককালে অভিভূত—যেন ভীষণ অজগর বেষ্টনে আবদ্ধ। ইহাও কবিত্ব। কিন্তু ইহা নাটকের কবিত্ব। হিন্দু অদৃষ্ট মহাকাব্যের কবিত্ব, কেন না গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা ইহার মূলে জ্ঞানের ভাগ বেশী। এই জন্য হিন্দু অদৃষ্টের খেল্‌না হইয়াও, অদৃষ্টকে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ঘরকন্না করে; গ্রীক কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অদৃষ্টের কঠিন শাসনে শাসিত হয়। এই জন্য ফলাফল সম্বন্ধেও হিন্দু অদৃষ্ট গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

দেখিলাম যে অদৃষ্ট মহাকবির কল্পনা এবং জ্ঞানমূলক। মনুষ্যের সুখ-দুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অদৃষ্টের আশ্রয় না লইলে চলে না। মানুষ মহাকবির বিকাশ মাত্র। অতএব মানুষ মহাকবির কল্পনা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া আত্মসাধনায় কৃতকার্য্য হইবে? মহাকবির কল্পনায় প্রবেশ করিতে না পারিলে মানুষ কি সভ্য হয়, শিক্ষিত হয়, না মানুষ হয়।

আরো এক কথা। অদৃষ্টের নাম করিয়া যে কাঁদে তার কান্নার মতন কান্না ত পৃথিবীতে আর নাই। কেন না সে কান্না অনন্তের দোহাই দিয়া কাঁন্না। অনন্ত যাহার কারণ অথবা যাহার কারণ অনন্ত, তাহার জন্য কাঁদি-বার কোন সংস্কোচ বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না—তাহার জন্য কাঁদিবার

কারণও অনন্ত। হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী—হিন্দুদের মতন কাঁদিতেও কেহ পারে না। কিন্তু হিন্দুরা কি কেবল কাঁদিয়াই ক্ষান্ত? তাহা যদি হইত তাহা হইলে হিন্দুপরিবারে এত প্রাণীর সমাবেশ কখনই হইত না। যখন ইউরোপে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রবল ছিল, তখন ইউরোপ দুঃখীর জন্য যত কাঁদিয়াছিল তত আর কখন কাঁদে নাই। কিন্তু তখন ইউরোপীয়েরা প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে অন্তরে অদৃষ্টবাদী ছিল। এইরূপ দেখিবে যেখানে দয়ার সমুদ্র সেইখানেই অদৃষ্টবাদ। ইহার অর্থ কি? বোধ হয় ইহার অর্থ এই যে, অদৃষ্ট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ের কামনা—দুঃখের সহিত অদৃষ্টের সংযোগ করিতে হৃদয় ভালবাসে এবং সেই সংযোগ করিয়া হৃদয় যত গলে, শুধু দুঃখ দেখিয়া তত গলে না। এমন কেন হয়? না, জ্ঞান বলিয়া দিতে পারুক আর নাই পারুক, হৃদয় মানুষকে বলিয়া দেয় যে মানুষের কোন কিছু স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়—সকলই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পদার্থ এবং অনন্ত শক্তির সহিত গাঁথা। হৃদয়ের গভীরতা অনন্ত, দৃষ্টি অনন্তব্যাপী এবং অনন্তভেদী। তাই হৃদয় হৃদয়ের পাত্রকে অনন্তকে উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। লীয়রের কষ্ট দেখিয়া আমাদের এত কষ্ট কেন হয়? তাঁহার দুর্ব্বল মনই ত তাঁহার যন্ত্রণার প্রধান কারণ। তবে কেন আমরা তাঁহাকে 'ঠিক হইয়াছে,' 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারি না? পারি না কেন—না, এত পাইয়া, রাজ্য, ধন, জন, সম্মান সব পাইয়া কেবল একটু মানসিক বল পাইলেন না এবং সেই জন্য রাজ্য, ধন, জন, সম্মান, শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন! আবার ওদিকে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের কথা মনে হইলে ভাবি যে, যে এত ভালবাসিতে পারে এবং এত ভালবাসা খুঁজে, সে সব পাইল, কিন্তু একটু সন্তানভাগ্য পাইল না! তখন হৃদয় কাঁদিয়া বলে, লীয়র যদি অদৃষ্টের হাতের—ব্রহ্মাণ্ডের মহাকবির হাতের খেলনা নন, ত সে খেলনা কে? লীয়রের কি দোষ? লীয়র বিশ্বের দুর্ভেদ্য রহস্যের রঙ্গের পদার্থ বই ত নয়? হৃদয়ের এই ভাব এবং সেই জন্য হৃদয় লীয়রের জন্য এত ব্যাকুল। অতএব হৃদয়ে অদৃষ্টের আসন, হৃদয়ে অদৃষ্টের প্রতিষ্ঠা, অদৃষ্ট হৃদয়ের পরিপোষক। হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যাহার জন্ম এবং হৃদয়ের যে পুষ্টিসাধন করে

সে কি ফেলিয়া দিবার সামগ্রী ?—সে কি জগতের অনন্ত মঙ্গলের কারণ নয় ?

দেখিলাম, অদৃষ্টের জন্ম জ্ঞানে, স্ফূর্ত্তি হৃদয়ে। একা জ্ঞানমূলক বিজ্ঞান কেমন করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিবে ? তাই বলি, অদৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দাম্ভিক কথায় মজিয়া তাহার অমূল্য নিধি অদৃষ্টকে ছাড়িয়া না দেয়। যাহা মানুষকে না মারিয়া রাখে, তাহাই মানুষের জীবনযাত্রার সম্বল। দাম্ভিক বিজ্ঞান দুঃখীকে মরিতে বলে। কিন্তু দুঃখী মরিলে সুখীও কি মরে না ? যতক্ষণ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পাও ততক্ষণই ত তোমার বাঁচিয়া থাকা সার্থক। তাই বলি, ভারত যেন ইউরোপের ঠাট্টার ভয়ে অদৃষ্টবাদ ছাড়ে না। অদৃষ্টবাদ ছাড়িলে যথার্থই ভারতের দুরদৃষ্ট ঘটিবে ; ভারতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে ; মনুষ্যত্ব কমিয়া যাইবে। ভারতে মনুষ্য-সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। ভারত দুঃখভারে অতল জলে ডুবিবে।

ফুল।

ফুলের ভাষা।

১—মন্দাকিনী।

আকাশে নক্ষত্র ফোটে; পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা, পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্দ্ধ এবং নিম্নার্দ্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর নীচে বাঁধা।

আবার ফুলের ডোরে নীচে সব বাঁধা। নীচে ফুল আর নক্ষত্র একই বস্তু, কেননা নক্ষত্রের কিরণ-ডোরে ও নীচে সব বাঁধা। একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ভুলিয়া যাও; গ্রীস, রোম, পারশ্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কণার্ক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, অম্বরস্ত্রবিহীন কাল্দীয় মেষপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাঁহারা দিনে ভেড়া চরাইতেছে, রাত্রে নক্ষত্র ভাবিতেছে। অথবা গো-মহিষ-সম্বল ভারতীয় আদিম আর্য্য-গণের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে গো-ধন বাড়াইবার জন্য কত গব্য-কাষ্ঠ জ্বালাইতেছে, রাত্রে আকাশে সপ্তর্ষি দেখিয়া সাধের গো-ধন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। তার পর সেই আদিমকাল

হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। হইয়া বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীর জিনিসে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে। নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা, আবহমান আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়নিহিত কৌতূহল! আবার পিছাইয়া যাও—সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয়যান প্রভৃতি সমস্ত বাহ্যসম্পদ ভুলিয়া, আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে তোমার যাহা আছে তাহার সে সব কিছুই নাই। কেবল তোমার যে ফুলটি আছে তাহারও সেই ফুলটি আছে। তার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর ক্রোড়ের মধ্যে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষ সব পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়াছিল এখনও সেই ফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধ, আবহমান অনুরাগ, গূঢ়তম প্রকৃতি! তাই বলি যে আকাশের নীচে ফুলের ডোরে আর নক্ষত্রের কিরণ-ডোরে সব বাঁধা। সেই জন্যই বুঝি ঐ দুইটি ডোর মিশিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুল! তুমি কি কঠিন! তোমার কল্পনাতীত কমনীয় কান্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা! বুঝি বাঁধিতে হইলে কমনীয়তা দ্বারাই বাঁধিতে হয়?

ফুল, তুমি মানব-গুরু! মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্ব টুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত ইস্কুল, কালেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কথা—ফুল তোলা। যে দিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধকরত মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্য্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতি দেখিয়া, কি জানি কেন, সেই পবনান্দোলিত বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণজ্যোতি পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেই দিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেই দিন জানা গেল যে, মহারণ্যনিবাসী সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল

মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহাসম্পদ সৃষ্টি করিবে। সেই দিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মানুষে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই আছে। সেই দিন জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্র চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মানুষ অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উঠিবে। সেই দিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সেই শিক্ষা, সেই উন্নতির মূলে—ক্ষুদ্র, কোমল, কমনীয় ফুল! কেন না ঊর্দ্ধতম-স্বর্গ, অনন্ত নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর আর কিছুর সহিত বাঁধা-নয়, কেবল ফুলের সহিত বাঁধা। অতএব যদি স্বর্গাভিমুখী হইতে হয়, যদি অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে হয়, তবে আদি গুরু ফুল ভুলিও না। আদি ছাড়া অন্ত নাই। ফুলের কোমলতা, ফুলের কমনীয়তা, ফুলের গগনস্পর্দ্ধী নির্ম্মলতা হারাইলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, অনন্তযাত্রা অকালে বন্ধ হইবে। অতএব, ভাই সকল, আমাদের মহারণ্যবাসী আদিপুরুষ যেমন মাথায় ফুল রাখিতেন, তেমনি করিয়া মাথায় ফুল রাখিয়া অগ্রসর হও।

ফুল, তুমি জগতের গূঢ় রহস্য!

ফুল সর্ব্বত্রই ফোটে। মরুভূমিতেও ফোটে, উদ্যান প্রদেশেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তর সীমার তুষাররাশির মধ্যেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তপ্ত কটি-দেশেও ফোটে, মনুষ্যের বাসস্থানেও ফোটে, মনুষ্যের অগম্য স্থানেও ফোটে। ফুল সর্ব্বব্যাপী।

আমি এখানে রহিয়াছি, ওখানে কি আছে জানি না। তুমি ওখানে রহিয়াছ, এখানে কি আছে জান না। ভারতে ইংলণ্ড নাই, ইংলণ্ডে ভারত নাই। ফ্রান্সে আমেরিকা নাই, আমেরিকায় ফ্রান্স নাই। এ স্থান মৃত্তিকাময়, এখানে সমুদ্র নাই। ওস্থান অগাধ সমুদ্র, ওখানে মৃত্তিকা নাই। তুমি সব জান না, আমি সব জানি না, ভারত ইংলণ্ড জানে না, ইংলণ্ড ভারত জানে না, মৃত্তিকা সমুদ্র জানে না, সমুদ্র মৃত্তিকা জানে না। ফুল সর্ব্বত্র ফোটে। ফুল সব জানে। ফুল সর্ব্বজ্ঞ।

ভারতবর্ষ, পারস্যদেশ, আরবদেশ, আফরিক মহাদেশ—এই সকল স্থান প্রখর রবির প্রখর রঙ্গভূমি। এই সকল স্থানে প্রখর রবিকিরণে সকলই

জ্বলিয়া যায়, পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যায়, জলাধার নদীগর্ভ ফাটিয়া বিকটাকার ধারণ করে। কিন্তু এ সকল স্থানে ফুল ফোটে। আবার লাপ্‌লাণ্ড, গ্রীণ্‌লাণ্ড, নবজেম্‌লা প্রভৃতি স্থানে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম, নীচে হিম, চতুঃপার্শ্বে হিম—যেন হিমাংশুর হিমশয্যা —হিমদেহ, হিমপ্রাণ, হিম-আত্মা! সে হিমে কিছুই বাঁচে না, মানুষ জমাট হইয়া যায়, জল জমাট হইয়া যায়, জগৎ জমাট হইয় যায়! কিন্তু সে হিমে ফুল ফোটে! ফুল সর্ব্বশক্তিমান। ফুলের কোমলতা শক্তির প্রাণ।

সুগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি—
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥

এখন বুঝিতেছি ফুল সর্ব্বত্র ফোটে কেন। একজন কবি-নাম খ্যাত ইংরেজ বলিয়াছেন ঃ—

Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.

মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র। মিথ্যা কথা—অসার কথা—অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি—জীবশূন্য, তৃণশূন্য, বারিশূন্য—জ্বালাময়, অগ্নিময়—প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে; কঠোরতা, কঠিনতা, নিষ্ঠুরতা প্রশ্বাসিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে—ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুদ্রমূর্ত্তিতে একটি অনির্ব্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে! প্রকৃতি ঐ কোমলতায় অনুপ্রাণিত। ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। তুমি দেখ আর নাই দেখ, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, প্রকৃতি ঐ কোমলতার গুণে পূর্ণতার ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে, সজীবতা অনুভব করিতেছে, আপনাপ্রেরণা-বায়ু আপনি প্রত্যক্ষ

করিতেছে।* ফুল, তুমি মরুভূমিতে ফুটিও, নহিলে মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে এবং মহাশক্তি শক্তিহীন হইবে। বিশ্বনিন্দিত পৌরাণিক কবি ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণীকে কোমলতম নীলোৎপলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে মরুভূমি কি পৃথিবীতে থাকিত? না মহাশক্তির প্রকৃত শক্তি বুঝা যাইত? মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে আকাশের নক্ষত্র কেমন করিয়া মরুভূমিকে পৃথিবী বলিয়া চিনিত? তুমি মরুভূমি দেখ আর নাই দেখ, কিন্তু মরুভূমিকে ত নক্ষত্রের কাছে পরিচিত হইতে হইবে। তাই মরুভূমিতে ফুল ফোটে। ফুলডোর ব্যতীত পৃথিবীকে আকাশের সহিত বাঁধা যায় না।

---

* এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হইবার কিছু দিন পরে মহাগুরু রস্কিণের নিম্নোদ্ধৃত মতটি পড়িয়া আমি চরিতার্থ হই। আনন্দোফুল্ল অন্তঃকরণে মতটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সৌন্দর্য্যের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বুঝাইয়া Ruskin বলিতেছেনঃ—"The characters above enumerated are not to be considered as stamped upon matter for our teaching and enjoyment only, but as the *necessary perfection* of God's working, and the inevitable stamp of his image on what he creates. For it would be inconsistent with his Infinite perfection to work imperfectly in any place, or in any matter; wherefore we do not find that flowers, and fair trees, and kindly skies, are given only where man may see them and be fed by them; but the spirit of God works everywhere alike, where there is no eye to see, covering all lonely places with an equal glory; using the same pencil and outpouring the same splendour, in the caves of the waters where the sea snakes swim, and in the desert where the satyrs dance, among the fir trees of the stork, and the rocks of the conies, as among those higher creatures whom he has made capable witnesses of his working." *Modern Painters*, Vol. II, p. 84.

মহারণ্যে মহান্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—যেন কোথাও কিছু নাই। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একটি ফুল ফুটিল। আর্য্য কবি গাহিলেন :—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং

ইত্যাদি।

সেই অবধি আর্য্য ভক্ত মহাশক্তির পদে জবাপুষ্পের অঞ্জলি দিতেছেন।

আর্য্য কবিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ফুল জগতের গূঢ়রহস্য। তাঁহাদের মতন ফুলের ভাষা আর কোথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। গ্রীক্ কবিগণ ফুলে যত মানসিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তদপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন। তাঁহারা বেশী ফুল কোরিণ্থিয়-স্তম্ভের শিরোপরি চাপাইতেন। রণপ্রিয় রোমানেরা রাজপথে ফুলের মালা ঝুলাইয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র ফুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কথা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কথাই পৃথিবীসম্বন্ধীয়, Midsummer Night's Dream-এ ও তদপেক্ষা বেশী নাই। কেবল ভারত ফুলে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই দেখিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ফুলে পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন; পৌরাণিক কবিগণ ফুলে স্বর্গের অথবা বিশ্বরহস্যের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছেন।

ফুল জগতের গূঢ় রহস্য। ফুল জগতের প্রাণ। ফুল-ডোরে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য বাঁধা। ফুল ছাড়া গতি নাই, ফুল ছাড়িলে স্বর্গের দ্বার খোলা যায় না। অতএব, ভারত সন্তানগণ! তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ফুল মাথায় করিয়া অগ্রসর হও। কিন্তু ফুলকে শুধু ফুল বলিয়া জানিলে চলিবে না। আরাধ্য পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় ফুলকে জগতের গূঢ় রহস্য, মহাশক্তির শক্তি, প্রকৃতির প্রাণ, স্বর্গদ্বারের চাবি বলিয়া না জানিলে তোমাদের যুগযুগান্তরের ফুলে—মেল ভাঙ্গিয়া যাইবে—তোমরা পৃথিবীর হাড়ী হইয়া পড়িবে।

ফুলের ভাষা।

২—সুরধুনী।

সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রবি নিস্তেজ হইয়া অস্তাচলে চলিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় জ্যোতি অল্পে অল্পে প্রখরতা হারাইয়া অনির্ব্ব-চনীয় মাধুর্য্যে পরিণত হইয়াছে। জ্যোতির বর্ণ স্থবর্ণ-নিন্দিত। সুবর্ণ-নিন্দিত জ্যোতি ঈষৎ ম্রিয়মাণ, যেন ষোড়শীর সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের ছায়া পড়িয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী হাস্যময়। সেই হাসিতে ফুলগাছে ফুলের কুঁড়ি একটি একটি করিয়া দেখা দিতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্যের হাসিতে ফুলের জন্ম। ফুলের কুঁড়ি বিশ্বের হাসির উচ্ছ্বাস—বিশ্বের হাসির সাকার মূর্ত্তি।

অল্পে অল্পে ঐ সুবর্ণ নিন্দিত জ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছে। অল্পে অল্পে ফুলের কুঁড়িগুলি ঐ মলিন আবরণে লুকাইয়া পড়িতেছে। এখন আর সে মলিন জ্যোতিও নাই—এখন সব অন্ধকার। এখন সে কুঁড়িগুলির কোথায় কি হইতেছে কে বলিবে? কিন্তু ঐ দেখ আকাশে একটি একটি করিয়া কত নক্ষত্র ফুটিয়া পড়িয়াছে, আর ঐ নক্ষত্ররাশির মধ্যে চতুর্থীর চাঁদ নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। আর নীচে পৃথিবীতে নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র আলোকরাশির মধ্যে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। এখন আর সে কুঁড়ি নাই। এখন কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইল কে বলিবে? কে বুঝিবে? এ রহস্য ভেদ করা কাহার সাধ্য? এ রহস্য কেহ

কখন ভেদ করিতে পারে নাই। বিক্টর হুগো বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন :—

"But yesterday she was a child, today she is an incomprehensible woman."

সূর্য্যের বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী আলোক এবং চন্দ্রের ছায়ারূপী আলোক এই দুই রকম আলোকের মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারের ভিতর কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোন পবিত্র শক্তি গোপনে, নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে ফুলের কুঁড়ি ফুটাইয়া দেয়। মানুষ সে শক্তি দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না। মানুষ কেবল সেই শক্তির কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হয়, আর আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। ইহাই ফুল ফুটিবার প্রণালী। সে প্রণালী মানুষের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই মানুষ ফুল দেখিয়া এত মুগ্ধ। পৃথিবীতে মানুষ মুগ্ধ—হৃদয়ের কার্য্যে এবং প্রতিভার কার্য্যে। ফুল, তোমাকে ফুটিতে দেখি, কিন্তু কেমন করিয়া ফোট তাহা বুঝিতে পারি না। তাই বলি তুমি বিশ্বের প্রতিভার কীর্ত্তি। তোমার মতন রহস্য, তোমার মতন কাব্য, তোমার মতন দৃশ্য পৃথিবীতে আর আছে কি?

আবার, ফুল, তুমি বিশ্বের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। সেই মধ্যাহ্ন রবির প্রখর শাসন মনে কর দেখি। তাপের পরিমাণ নাই। মাটী উত্তপ্ত হইয়া উত্তপ্ত কটাহের ন্যায় স্পর্শমাত্রে স্পর্শকারীর হস্তপদ যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় যে সকল পশু পক্ষী মাঠের উপর বিচরণ করিতেছিল তাহারা আর সেই অগ্নিবৎ ভূমিখণ্ডোপরি বিচরণ করিতে না পারিয়া কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় কেহ বৃক্ষশাখায় নিরাশার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় মুমূর্ষুবৎ বসিয়া আছে বা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন কি, দুর্দ্ধর্ষ শৃগাল কুক্কুর এবং বায়সগণ কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। নদ নদী তড়াগ পুষ্করিণীর বারিরাশি এমনই উত্তপ্ত হইয়াছ যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে তথাপি এক গণ্ডূষ জল লইয়া পান করিতে সাহস করিতেছে না এবং মৎস্য কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ জলক্রীড়া আহারান্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া বারিরাশির নিম্নতম প্রদেশে পঙ্কের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কোন মতে প্রাণরক্ষা করিতেছে। মানুষ সকল-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রবির উত্তাপে মৃতবৎ হইয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রুদ্ধশ্বাস রোগীর ন্যায় ঘরের

ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। আর দেখিতে পারি না—আর সহিতে পারি না—আর বলিয়া জানাইতে পারি না। কাহাকেই বা জানাইব? সকলেই ত আমার মতন পুড়িয়া যাইতেছে। বিশ্বশক্তি কঠিন নিষ্ঠুর সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যেন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কণামাত্র দয়া নাই, কৃপা নাই, করুণা নাই! সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে করুণা নাই? সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় নাই? আছে বৈ কি। ঐ দেখ সেই প্রখর রবি এখন অস্তাচলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের ক্লেশে কাতর হইয়া এখন বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিতেছেন। ঐ দেখ অসীম বিশ্ব এখন বিশ্ব-শক্তির করুণার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া সক্তজ্ঞচিত্তে, মুগ্ধান্তঃকরণে গদগদ ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে ডুবিয়া পড়িতেছে। চারি দিকে শীতল মধুর বায়ু বহিতেছে। নিঃশব্দে নিস্তব্ধভাবে পৃথিবীর বারি-রাশি সুমধুর সুশীতল শ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত মধুময়, মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, কোমল তৃণ হইতে কি এক অনুপম কল্পনাতীত মধুরিমা নির্গত হইতেছে। অনুপ্রাণিত জীববৃন্দের প্রাণের প্রাণ হইতে কি এক অপূর্ব্ব রসের লহরী নিঃসৃত হইতেছে। এই সমস্ত মধুরতা চতুর্থীর চাঁদের নির্ম্মল, সুশীতল, সুমধুর চন্দ্রিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আর সেই মুগ্ধ চন্দ্রিকার প্রাণের প্রাণ ফুলরূপে ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই বিশ্বের হৃদয়রূপ ফুলের নেশায় মানুষ ভোর হইয়া উঠিতেছে। মানুষ সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া সেই ফুলের ভিতর গলিয়া যাইতেছে। ফুল রসে ভরিয়া উঠিতেছে। অনন্ত আকাশ সমস্ত রাত্রি সেই কোমল ফুলে কোমল সুধা ঢালিয়া দিতেছে, কোমল উষাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর, ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত মধুমক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই হৃদয়রূপ ফুলের হৃদয়গত সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফুল! এ জগতে ক্ষুদ্রের নিমিত্ত কাহারো হৃদয়ে সুধা নাই, কেবল তোমার আছে। তুমি যথার্থই বিশ্বের হৃদয়ের হৃদয়! তোমার হৃদয়ের গুণে তুমি রাজার উদ্যানেও ফোট, গৃহস্থের প্রাঙ্গণেও ফোট, দরিদ্র কৃষকের গোময়স্তূপোপরি ও ফোট। তোমাকে কেবল জটাজুটধারী সন্ন্যাসী-সদৃশ ঝাউ, দেবদ্রুম, সরলদ্রুম প্রভৃতি গোটাকত গাছে বড় ভাল রকম দেখিতে পাই না, এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় বহুলোকাশ্রয় বট,

অশ্বত্থ প্রভৃতি দুই চারিটা গাছে বেশী দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ সকল গাছের অন্তর খুঁজিলে তোমাকে দেখিতে পাই কি না বলিতে পারি না। বুঝি বা খুবই পাই।

ফুল, তুমি ফোট কেন? আকাশে নক্ষত্র ফোটে বলিয়া? তা ত জানি। কিন্তু আমি জানিতে চাই, ফুটিয়া তোমার কি লাভ? তুমি কি জন্য ফোট? একথা আমি তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সন্ধ্যার আধ-ছায়া আধ-আলোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। গভীর নিশীথে অনন্ত আকাশের দিব্য দিয়া, অনন্ত নক্ষত্রের দিব্য দিয়া, অনন্ত পথের পথিক চন্দ্রের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। নিশাবসানে উদয়াচলস্থ রাগরূপী সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, সত্য কথা না বলিলে ঐ অগ্নিশর্ম্মা তোমাকে পোড়াইয়া মারিবে, এই রূপ ভয় দেখাইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। তোমাকে কত স্তব স্তুতি করিয়াছি, কত খোসামদ করিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। কেবল একটিবার মাত্র যখন তোমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম, যে, উত্তর না দিলে ঐ যে ক্ষুদ্র মক্ষিকাটি তোমার বুকের অমৃত পান করিতেছে, ঐটিকে মারিয়া ফেলিব, তখন ব্যাকুল হইয়া তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন? উত্তর দিতে কি তোমার ভয় হয়? তা ত নয়। যখন তোমাকে পোড়াইবার ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখন ত তোমাকে ভয়ে জড় সড় হইতে দেখি নাই? তখন ত তোমার সেই স্বাভাবিক লজ্জাশীল, বিনয়নম্র, প্রফুল্ল মুখ খানি বই আর কিছুই দেখি নাই? কোন কোন কবি বলিয়া থাকেন যে তুমি ফোট কেন, না ফুটিয়াই তোমার সুখ। কিন্তু সে কথাটি আমার মনে লাগে না। সে কথায় আমি তোমার হৃদয়ের তত্ত্ব পাই না। ফুটিয়াই তুমি যদি সুখী হইতে, তাহা হইলে তোমার মুখেই ত সে কথা শুনিতে পাইতাম। যার ফুটিয়াই সুখ সে ত আপনার শক্তি, আপনার তেজ আপনি বুঝে; সে ত আপনার তেজে আপনি তেজস্বী, আপনার তেজে আপনি ফাটিয়া পড়ে; সে ত আপনার সুখের নেশায় আপনি

ফুলের ভাষা।

২—সুরধুনী।

সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রবি নিস্তেজ হইয়া অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় জ্যোতি অল্পে অল্পে প্রখরতা হারাইয়া অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিণত হইয়াছে। জ্যোতির বর্ণ সুবর্ণ-নিন্দিত। সুবর্ণ-নিন্দিত জ্যোতি ঈষৎ ম্রিয়মাণ, যেন ষোড়শীর সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের ছায়া পড়িয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী হাস্যময়। সেই হাসিতে ফুলগাছে ফুলের কুঁড়ি একটি একটি করিয়া দেখা দিতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্যের হাসিতে ফুলের জন্ম। ফুলের কুঁড়ি বিশ্বের হাসির উচ্ছ্বাস—বিশ্বের হাসির সাকার মূর্ত্তি।

অল্পে অল্পে ঐ সুবর্ণ নিন্দিত জ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছে। অল্পে অল্পে ফুলের কুঁড়িগুলি ঐ মলিন আবরণে লুকাইয়া পড়িতেছে। এখন আর সে মলিন জ্যোতিও নাই—এখন সব অন্ধকার। এখন সে কুঁড়িগুলির কোথায় কি হইতেছে কে বলিবে? কিন্তু ঐ দেখ আকাশে একটি একটি করিয়া কত নক্ষত্র ফুটিয়া পড়িয়াছে, আর ঐ নক্ষত্ররাশির মধ্যে চতুর্থীর চাঁদ নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। আর নীচে পৃথিবীতে নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র আলোকরাশির মধ্যে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। এখন আর সে কুঁড়ি নাই। এখন কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইল কে বলিবে? কে বুঝিবে? এ রহস্য ভেদ করা কাহার সাধ্য? এ রহস্য কেহ

কখন ভেদ করিতে পারে নাই। বিক্টর হুগো বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন :—

"But yesterday she was a child, today she is an incomprehensible woman."

সূর্য্যের বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী আলোক এবং চন্দ্রের ছায়ারূপী আলোক এই দুই রকম আলোকের মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারের ভিতর কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোন পবিত্র শক্তি গোপনে, নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে ফুলের কুঁড়ি ফুটাইয়া দেয়। মানুষ সে শক্তি দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না। মানুষ কেবল সেই শক্তির কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হয়, আর আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। ইহাই ফুল ফুটিবার প্রণালী। সে প্রণালী মানুষের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই মানুষ ফুল দেখিয়া এত মুগ্ধ। পৃথিবীতে মানুষ মুগ্ধ—হৃদয়ের কার্য্যে এবং প্রতিভার কার্য্যে। ফুল, তোমাকে ফুটিতে দেখি, কিন্তু কেমন করিয়া ফোট তাহা বুঝিতে পারি না। তাই বলি তুমি বিশ্বের প্রতিভার কীর্ত্তি। তোমার মতন রহস্য, তোমার মতন কাব্য, তোমার মতন দৃশ্য পৃথিবীতে আর আছে কি ?

আবার, ফুল, তুমি বিশ্বের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। সেই মধ্যাহ্ন রবির প্রখর শাসন মনে কর দেখি। তাপের পরিমাণ নাই। মাটী উত্তপ্ত হইয়া উত্তপ্ত কটাহের ন্যায় স্পর্শমাত্রে স্পর্শকারীর হস্তপদ যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় যে সকল পশু পক্ষী মাঠের উপর বিচরণ করিতেছিল তাহারা আর সেই অগ্নিবৎ ভূমিখণ্ডোপরি বিচরণ করিতে না পারিয়া কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় কেহ বৃক্ষশাখায় নিরাশার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় মুমূর্ষুবৎ বসিয়া আছে বা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন কি, দুর্দ্ধর্ষ শৃগাল কুক্কুর এবং বায়সগণ কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। নদ নদী তড়াগ পুষ্করিণীর বারিরাশি এমনই উত্তপ্ত হইয়াছ যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে তথাপি এক গণ্ডূষ জল লইয়া পান করিতে সাহস করিতেছে না এবং মৎস্য কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ জলক্রীড়া আহারান্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া বারিরাশির নিম্নতম প্রদেশে পঙ্কের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কোন মতে প্রাণরক্ষা করিতেছে। মানুষ সকল-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রবির উত্তাপে মৃতবৎ হইয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রুদ্ধশ্বাস রোগীর ন্যায় ঘরের

ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাই-তেছে। আর দেখিতে পারি না—আর সহিতে পারি না—আর বলিয়া জানাইতে পারি না। কাহাকেই বা জানাইব? সকলেই ত আমার মতন পুড়িয়া যাইতেছে। বিশ্বশক্তি কঠিন নিষ্ঠুর সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যেন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কণামাত্র দয়া নাই, কৃপা নাই, করুণা নাই! সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে করুণা নাই? সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় নাই? আছে বৈ কি। ঐ দেখ সেই প্রখর রবি এখন অস্তাচলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের ক্লেশে কাতর হইয়া এখন বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিতেছেন। ঐ দেখ অসীম বিশ্ব এখন বিশ্ব-শক্তির করুণার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া সকৃ-তজ্ঞচিত্তে, মুগ্ধান্তঃকরণে গদগদ ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে ডুবিয়া পড়িতেছে। চারি দিকে শীতল মধুর বায়ু বহিতেছে। নিঃশব্দে নিস্তব্ধভাবে পৃথিবীর বারি-রাশি সুমধুর সুশীতল শ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত মধুময়, মাধুর্য্যময় করিয়া তুলি-তেছে। বৃক্ষ, লতা, কোমল তৃণ হইতে কি এক অনুপম কল্পনাতীত মধুরিমা নির্গত হইতেছে। অনুপ্রাণিত জীববৃন্দের প্রাণের প্রাণ হইতে কি এক অপূর্ব্ব রসের লহরী নিঃসৃত হইতেছে। এই সমস্ত মধুরতা চতুর্থীর চাঁদের নির্ম্মল, সুশীতল, সুমধুর চন্দ্রিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আর সেই মুগ্ধ চন্দ্রিকার প্রাণের প্রাণ ফুলরূপে ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই বিশ্বের হৃদয়রূপ ফুলের নেশায় মানুষ ভোর হইয়া উঠিতেছে। মানুষ সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া সেই ফুলের ভিতর গলিয়া যাইতেছে। ফুল রসে ভরিয়া উঠিতেছে। অনন্ত আকাশ সমস্ত রাত্রি সেই কোমল ফুলে কোমল সুধা ঢালিয়া দিতেছে, কোমল উষাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর, ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত মধুমক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই হৃদয়রূপ ফুলের হৃদয়গত সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফুল! এ জগতে ক্ষুদ্রের নিমিত্ত কাহারো হৃদয়ে সুধা নাই, কেবল তোমার আছে। তুমি যথার্থই বিশ্বের হৃদয়ের হৃদয়! তোমার হৃদয়ের গুণে তুমি রাজার উদ্যানেও ফোট, গৃহস্থের প্রাঙ্গণেও ফোট, দরিদ্র কৃষকের গোময়স্তূপোপরি ও ফোট। তোমাকে কেবল জটাজূটধারী সন্ন্যাসী-সদৃশ ঝাউ, দেবদ্রুম, সরলদ্রুম প্রভৃতি গোটাকত গাছে বড় ভাল রকম দেখিতে পাই না, এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় বহুলোকাশ্রয় বট,

অশ্বত্থ প্রভৃতি দুই চারিটা গাছে বেশী দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ সকল গাছের অন্তর খুঁজিলে তোমাকে দেখিতে পাই কি না বলিতে পারি না। বুঝি বা খুবই পাই।

ফুল, তুমি ফোট কেন? আকাশে নক্ষত্র ফোটে বলিয়া? তা ত জানি। কিন্তু আমি জানিতে চাই, ফুটিয়া তোমার কি লাভ? তুমি কি জন্য ফোট? একথা আমি তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সন্ধ্যার আধ-ছায়া আধ-আলোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। গভীর নিশীথে অনন্ত আকাশের দিব্য দিয়া, অনন্ত নক্ষত্রের দিব্য দিয়া, অনন্ত পথের পথিক চন্দ্রের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। নিশাবসানে উদয়াচলস্থ রাগরূপী সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, সত্য কথা না বলিলে ঐ অগ্নিশর্ম্মা তোমাকে পোড়াইয়া মারিবে, এই রূপ ভয় দেখাইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। তোমাকে কত স্তব স্তুতি করিয়াছি, কত খোসামদ করিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। কেবল একটিবার মাত্র যখন তোমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম, যে, উত্তর না দিলে ঐ যে ক্ষুদ্র মক্ষিকাটি তোমার বুকের অমৃত পান করিতেছে, ঐটিকে মারিয়া ফেলিব, তখন ব্যাকুল হইয়া তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন? উত্তর দিতে কি তোমার ভয় হয়? তা ত নয়। যখন তোমাকে পোড়াইবার ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখন ত তোমাকে ভয়ে জড় সড় হইতে দেখি নাই? তখন ত তোমার সেই স্বাভাবিক লজ্জাশীল, বিনয়নম্র, প্রফুল্ল মুখ খানি বই আর কিছুই দেখি নাই? কোন কোন কবি বলিয়া থাকেন যে তুমি ফোট কেন, না ফুটিয়াই তোমার সুখ। কিন্তু সে কথাটি আমার মনে লাগে না। সে কথায় আমি তোমার হৃদয়ের তত্ত্ব পাই না। ফুটিয়াই তুমি যদি সুখী হইতে, তাহা হইলে তোমার মুখেই ত সে কথা শুনিতে পাইতাম। যার ফুটিয়াই সুখ সে ত আপনার শক্তি, আপনার তেজ আপনি বুঝে; সে ত আপনার তেজে আপনি তেজস্বী, আপনার তেজে আপনি ফাটিয়া পড়ে; সে ত আপনার সুখের নেশায় আপনি

উন্মত্ত; সে ত আপনার মদে আপনি মত্ত; সে ত স্ফূর্ত্তিশীল, বাচাল, দাম্ভিক। সে ত স্তবে তুষ্ট হয়, সুখনাশের ভয়ে শক্রর নিকট হইতে পলায়ন করে। কিন্তু তোমার ত সে রকম প্রকৃতি নয়। তুমি চন্দ্রের শীতল, সুধাময় আলোকে উন্মত্ত হও না, আবার প্রচণ্ড রবির বিশ্বদগ্ধকারী রশ্মিতে অকাতরে তোমার ক্ষুদ্র কোমল বুকটুকু পাতিয়া দাও, সে বুকটুকু সে অগ্নিতে পুড়িয়া গেলেও তুমি দুঃখিত নও। তবে, ফুল, তুমি ফোট কেন? তুমি এ কথার উত্তর দিবে না তা জানি। বুঝিতেছি তুমি এ কথার অর্থ জান না,—কেমন করিয়া উত্তর দিবে? কিন্তু তোমাকে দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে রকম সুখী, তুমি যেমন অকাতরে কি বড় কি ছোট, কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকলকেই সমান আদরে তোমার হৃদয়ের সুধা ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত কর, তুমি যে রকম করিয়া মরুভূমিকেও হাস্যময় করিয়া তোল, তুমি যেমন অকাতরে আপনার কোমল হৃদয় পোড়াইয়া ফেলিতে পার, তাহা ভাবিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে ফুটিয়া তোমার সুখ নয়, ফুটাইয়াই তোমার সুখ। তুমি স্বয়ং একথা বলিবে না তা জানি, বলিতে পারিবে না তা জানি, কেন না ফুটাইয়াই যাহার সুখ, সেই জগতে মহৎ, সে আপনাকে আপনি জানে না, সে সব ফুটায় কিন্তু মারিয়া ফেলিলেও আপনি ফুটিতে পারে না। ফুল! এ জগতে ফুটান কেবল তোমারি ধর্ম্ম, তোমারি কর্ম্ম, তোমারি ব্রত। তুমিই এ জগৎ রক্ষা করিতেছ, তুমিই এ জগতের প্রাণ। তুমি পৃথিবীরূপে স্বর্গ!

তাই বুঝি, ফুল, তুমি চিরকাল ভাবরূপী। স্বর্গ কেহ কখন বুঝিল না; স্বর্গ চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, তোমাকেও কেহ কখন জ্ঞানের দ্বারা বুঝিল না; তুমি চিরকালই ভাবময়— ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, এমন ভাব নাই যাহা তোমাতে দেখিতে পাই না। গাম্ভীর্য্য বল, প্রফুল্লতা বল, নম্রতা বল, লজ্জাশীলতা বল, সরলতা বল, উল্লাস বল, শোক বল, বিষাদ বল, বিমর্ষ বল, চপলতা বল, সঙ্কোচ বল, সকলই তোমাতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বুঝাইতে হয় তাহা জানি না। কেমন করিয়াই বা বুঝাইব? তোমাতে যখন যে ভাব দেখি, তখনই সেই ভাবে ভোর হইয়া যাই, তখন সমস্ত জগৎ

সেই ভাবে ভোর বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বুঝাই? আর বুঝাইলেই বা বুঝিবে কে? সকলেই ত আমার মতন তোমার ভাবে ভোর। তুমি ক্ষুদ্র ফুল, তোমার শক্তি অসীম। যেখানে তুমি, সেখানে আর কিছুই থাকিতে পারে না, সেখানে সবই তুমি। ক্ষুদ্র ফুল, তুমি অমোঘ মন্ত্র। তোমার ভাবরূপ নিশ্বাসে সকলই গলিয়া ভাবময় হইয়া যায়। পাথরের পাহাড়ে তুমি হাসিলে পাথরের পাহাড়ও হাসির পাহাড় বলিয়া বোধ হয়। ফুল, তুমিই পৃথিবীর ভাবের ছাঁচ! তুমিই পৃথিবীতে ভাবরূপী মন্ত্র!

আর সেই জন্যই, ফুল, তুমি সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। জগতে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি আকাশ সৌন্দর্য্যময়। আবার আকাশ অপেক্ষা ঊর্দ্ধতর প্রদেশ, যাহা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যময়, সৌন্দর্য্যের উৎস বলিয়া মনে হয়। এ সৌন্দর্য্যের অর্থ কি? এ সৌন্দর্য্য কিসে হয়? অনেকে ভ্রান্ত হইয়া এই কথার কত ভ্রান্তিমূলক উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে বর্ণবিশেষের নাম সৌন্দর্য্য —বর্ণ বিশেষ সৌন্দর্য্যের কারণ বা উপাদান। যাহাতে সে বর্ণ আছে তাহা সুন্দর, যাহাতে সে বর্ণ নাই তাহা সুন্দর নয়। ফুল তোমাকে দেখিলে ত এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমাতে কোন্ বর্ণ নাই?— নীল, পীত, হরিৎ, শ্বেত, যত বর্ণ আছে এবং যত রকমে বর্ণের সংযোগ এবং মিশ্রণ হইতে পারে সকলই ত তোমাতে আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে বর্ণ বিশেষের গুণে সৌন্দর্য্য? আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আকার বিশেষের নাম সৌন্দর্য্য—আকার বিশেষ সৌন্দর্য্যের উপাদান। কিন্তু, ফুল, তোমাকে দেখিলে একথাও ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, তোমাতে অনেক আকার দেখিয়া থাকি। কিন্তু তোমাকে যে আকারে দেখি তুমি সেই আকারেই সুন্দর। তবে কি, ফুল, তুমি সৌরভের গুণে সুন্দর? তাই বা কেমন করিয়া বলি? কত ফুল ফোটে যাহার সৌরভ নাই, কিন্তু সে ফুলও ত সুন্দর। তাই বলি, ফুল, তুমি কেবল তোমার ভাবের গুণে সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। এবং তুমি,

ক্ষুদ্র ফুল, তুমিই জগৎকে এই মহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেও যে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে যাহা কিছু সুন্দর আছে তাহা কেবল ভাবের গুণেই সুন্দর। একজন ইংরাজ কবি জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছেন—

It is a sigh made stone!

যিনি এ কথা বলিয়াছেন তিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিয়াছেন।—তিনি বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য্য চক্ষে দেখা যায় না, কেবল ভাবের ঘোরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, ভাই সকল, যদি সুন্দর হইতে চাও, যদি জগতের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হও তবে ফুলের কাছে যাইও, ফুল তোমাকে শিখাইয়া দিবে যে সৌন্দর্য্য রূপে নাই, সৌন্দর্য্য গুণে; সৌন্দর্য্য আকারে নাই, গঠনে নাই, রঙে নাই, সৌন্দর্য্য ভাবে। ফুলের কাছে এই শিক্ষা লইয়া ফুলের ভাবে ভরিয়া থাকিও, দেখিবে তোমাদের সুখের সীমা নাই, তোমাদের অদৃষ্টচক্র অনন্ত উন্নতির পথে ঘুরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু ফুল, তোমাকে হৃদয়রূপেই দেখি, ভাবরূপেই দেখি, আর সৌন্দর্য্যরূপেই দেখি, তুমি যে কি রহস্য তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেখ যখন সন্ধ্যার মৃদু-মধুর শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেবালয়সম্মুখস্থ শেফালিকা-মূলে উপবেশন করি, তখন আমার ক্ষুদ্র দেহের সামান্য সংঘর্ষে রাশি রাশি শেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া চারিদিক্ ছাইয়া ফেলে; অথবা যখন প্রাতঃকালের সঞ্জীবনী সমীরণে উৎফুল্ল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন কেবল মাত্র আমার গমনজনিত বায়ুসঞ্চালনে ঐ প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ কামিনীবৃক্ষ হইতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামিনী ফুল ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়ে! এ দিকে ত দেখি, তুমি এমনি কোমল, এমনি অসহিষ্ণু, এমনি ভঙ্গুর যে শুধু যেন একটু নিশ্বাস গায় লাগিলে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি এক রকম হইয়া যাও। কিন্তু আবার ঐ দেখ দেখি ওখানে তোমাকে কি ভিন্ন প্রকৃতির দেখিতেছি। ঐ দেখ আজ মহাসমুদ্রে নিদাঘ-ঝটিকা উঠিয়াছে। অপরাহ্ণ-রবি অদৃশ্য হইয়াছে। আকাশ মেঘ-যুদ্ধে সংক্ষুব্ধ। অসংখ্য মেঘখণ্ড ভীমরবে গর্জ্জন করিতে করিতে অনন্ত আকাশে পরস্পরকে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছে; এক এক খানা মেঘ ক্রুদ্ধ হইয়া অপর মেঘের প্রতি

তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, আর অমনি দিগ্‌দিগন্ত ঝলসিয়া উঠিতেছে এবং বিকট শব্দে চমকিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের নীল জল কাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল জলে প্রচণ্ড ঝটিকোত্থিত ভীষণ তরঙ্গ সকল নভোমণ্ডলস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে তাড়না করিতেছে এবং রাগে ফেণা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গর্জ্জন করিয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। আকাশে মেঘ-গর্জ্জন, সমুদ্রে তরঙ্গ গর্জ্জন, আকাশ-সমুদ্রে ঝটিকা-গর্জ্জন, আর সেই সমস্ত গর্জ্জনরাশি ভেদ করিয়া ঝটিকা-পক্ষীর উৎকট চীৎকার—যেন এই মহাপ্রলয়ের অন্তরাল হইতে প্রলয়শক্তি প্রলয় তূর্য্য ধ্বনিত করিতেছে। এই মহাপ্রলয়ে পড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড অর্ণবযান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। বড় বড় মোটা মোটা পাল তরঙ্গাঘাতে ছিঁড়িয়া কুটী কুটী হইয়া যাইতেছে, বড় বড় মাস্তুল ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকাকারে ভাসিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ একটী ক্ষুদ্র ফুল কোথা হইতে আসিয়া ঐ ঝটিকা-তাড়িত ভীষণ তরঙ্গোপরি অসীম সাহসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রলয়যন্ত্রণা দেখিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু একটীও পাপ্‌ড়ি খসে নাই, একটীও পাপ্‌ড়ি সরে নাই! ফুল, কে বলে তুমি কোমল? তুমি দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়! কে বলে তুমি অসহিষ্ণু? তুমি সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ! কে বলে তুমি ভয়-কুণ্ঠিত? তুমি সাহসের, তুমি বীরত্বের জীবন্ত প্রতিমা! তোমার অপেক্ষা রহস্য এ জগতে আর কি আছে! তুমি বৈপরীত্যের আধার! এই জন্য মানুষ সমাজের প্রারম্ভ হইতে কোমলহৃদয় কবি এবং সাহস সহিষ্ণুতা এবং শক্তির আদর্শরূপী ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীর, উভয়েরই শিরোপরি ফুলের মালা চাপাইয়া কোমলতার এবং বীরত্বের পুরস্কার করিয়া আসিতেছে। যে মহাপুরুষ এ জগতে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য, কেবল তিনিই মাথায় ফুল পরিতে পারেন। অতএব, ভারতসন্তানগণ, যদি তোমরাও মাথায় ফল পরিতে চাও, তবে দেহ, মন, প্রাণ সংকল্প করিয়া যাহাতে হৃদয়ের কোমলতা-গুণে এবং জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বীরত্বগুণে মনুষ্য সমাজে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য হও, সে চেষ্টা কর। প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের চেষ্টা যেন সফল হয়, বীরভূষণ ফুল যেন তোমাদের শিরে শোভা পায়।

সুবিস্তীর্ণ কাননে সন্ধ্যা-সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। গাছের পাতা অল্প অল্প নড়িতেছে। আকাশে নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিতেছে। দুই এক খানা পাতলা শাদা মেঘ আস্তে আস্তে উড়িয়া যাইতেছে। সেই মেঘের ভিতর দিয়া এক রাশি ছায়ারূপী জ্যোৎস্না একখানা আবেশময় আবরণে আকাশ, পৃথিবী, দিগ্দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাননে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। শরীর আবেশময়, মন আবেশময়, পৃথিবী আবেশময়। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। চক্ষে কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, যেন কি একখানা হইয়া গিয়াছি, যেন এই আবেশময় দৃশ্যে মিশিয়া গিয়াছি। এই এক-রকম হইয়া পড়িয়া আছি আর কত কি দেখিতেছি, কত কি শুনিতেছি। শুনিতেছি কানন, পৃথিবী, অনন্তশূন্য জুড়িয়া এক অপূর্ব্ব, অস্ফুট, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে। সে সঙ্গীত ক্ষুদ্র তৃণ হইতে নির্গত হইতেছে, কত শত লতা হইতে নির্গত হইতেছে, কত ছোট ছোট, কত বড় বড় গাছ হইতে নির্গত হইতেছে, কত সলিলরাশি হইতে, কত প্রস্তর কত পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছে, ভূগর্ভ হইতে, ঊর্দ্ধতম আকাশ হইতে নির্গত হইতেছে। যেন তৃণ, লতা, পাতা, গাছ, পাথর, পর্ব্বত, জল, জঙ্গল সকলে মিলিয়া-মাতিয়া একস্বরে এক গানে গাহিতেছে —আজ আমরা সব এক হইয়াছি, আজ আমাদের মধ্যে ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই, আজ আমরা বিরোধশূন্য, বিদ্বেষশূন্য, বিকারশূন্য, আজ আমরা চক্ষু পাইয়াছি, এক চক্ষে সকলে সকলকে এক-আত্মা দেখিতেছি, আজ আমরা প্রাণ পাইয়াছি, আজ অমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে মিশিয়াছি। এই মোহকর সঙ্গীতে মজিতেছি আর দেখিতেছি কত অশরীরী, ছায়ারূপী, নির্ম্মল, সুন্দর, হাস্যময় মূর্ত্তি আসিতেছে, যাইতেছে, উড়িতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, ফুলের ভিতর লুকাইতেছে, ফুল দেখিতে দেখিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছে। কত শান্ত, সুধীর, সরল, ভাবময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে, অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনি করিতে করিতে শূন্য হইতে নামিয়া কত ফুলের গাছ বেষ্টন করিয়া গদ গদ ভাবে ফুল-স্তোত্র গাহিতেছে আর ফুল তুলিয়া ফুলকে অঞ্জলি পূরিয়া উপহার দিতেছে। এক একটী পবিত্র জ্যোৎস্না-ময় মূর্ত্তি আস্তে আস্তে ফুলের কাছে আসিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে

আর কি জানি কি শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া অসীম শূন্যে উড়িয়া যাই-তেছে, এবং নিমেষ মধ্যে নামিয়া আবদ্ধ মুষ্টি খুলিয়া ফুলটীকে বলিতেছে —এই লও তোমার সাধের বুধগ্রহ লও। তখন সেই সব স্বপ্নময়মূর্ত্তি, সেই অপূর্ব্ব আবেশময় পুষ্প-কাননে দাঁড়াইয়া একস্বরে, এক তানে এক অশ্রুত-পূর্ব্ব ফুলস্তোত্র পড়িয়া সগর্ব্বে গাহিয়া উঠিল ;—

Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire,
We do wander everywhere,
Swifter than the moone's sphere.

গান শুনিয়া আমার চমক হইল। আমি বুঝিলাম যে এই সকল মহাপুরুষ ফুলকে কল্পনার চক্ষে কল্পনাময় দেখিয়া অনন্তশক্তি লাভ করিয়াছে, রাগ দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত হইয়া প্রেম-বলে এক-প্রাণ এক-আত্মা হইয়া গিয়াছে। এবং প্রতিভাবলে এই অসম্পূর্ণ জগতে এক অপূর্ব্ব আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব, ভাই সকল, তোমরা ফুলকে শুধু হৃদয় বা ভাব বা সৌন্দর্য্য রূপে দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না। তাহা হইলে ফুলের সম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না। তোমরা ফুলকে কল্পনার চক্ষে দেখিও, তাহা হইলে ফুল হইতে অনন্ত শক্তি লাভ করিবে এবং যে জগৎ শুধু কল্পনায় রহিয়াছে সত্য সত্যই সেই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

ফুলের ভাষা।

৩—ভোগবতী।

আর এই শীতকালটা ভাল লাগে না। যে অনন্ত নীল আকাশ দেখিতে এত সুন্দর, এত সুশ্রী—যে অনন্ত আকাশে অনন্ত-নক্ষত্ররাজি-পরিবেষ্টিত, অনন্ত-শোভায়-শোভিত চন্দ্রমণ্ডল দেখিলে এত আহ্লাদ, এত উল্লাস, এত মোহ জন্মে, শীতকালে সে সব কিছুই থাকে না। এই স্থূল এবং দৃষ্টি-ও-ঘ্রাণের অপ্রীতিকর পদার্থে পরিপূর্ণ জড়জগৎ হইতে কি এক রকম ধূমবৎ কুরূপ এবং স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্প উঠিয়া মানুষের চক্ষু এবং আকাশরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আবাস স্থলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। মানুষ অতুল রূপের পরিবর্ত্তে অসহনীয় কুরূপ দেখিতে থাকে। দ্রষ্টব্য জগতের উপরার্দ্ধ বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না, দেখিলে বিরক্তি জন্মে এবং মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। জগতের নিম্নার্দ্ধও তদ্রূপ। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মনোহর, বৃক্ষলতাশোভিত তটভূমিবেষ্টিত স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী; সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত, প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত, সুনির্ম্মল, বারিপূর্ণ সরোবর; পর্ব্বতোদ্ভূতা, ক্রীড়াময়ী, রঙ্গপ্রিয়া, চঞ্চলনেত্রা, মধুরভাষিণী, স্রোতস্বিনী; সুদূরবিস্তৃত, গাম্ভীর্য্যময়, গর্জ্জনপ্রিয়, বাত্যান্দোলিত, সুনীল, স্ফীতবক্ষ সমুদ্র—এ সকলই শীতকালে সেই অনন্ত বিস্তৃত কু-রূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশিতে আবৃত। ইহাদের সমস্ত রূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত আকাশের অতুল সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিলুপ্ত বা কলুষিত। পৃথিবী এবং আকাশ একটা ঘোলা আবরণে মণ্ডিত। দেখিয়

চক্ষু পরিতৃপ্ত হয় এমন কিছুই নাই। বৃক্ষে পত্র নাই। বৃক্ষের শাখা গুলা এক একখানা পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় এ দিকে ও দিকে প্রসারিত। বৃক্ষটা যেন মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কীট, পতঙ্গ, পশু, কেহ ক্রীড়া করিতেছে না—সকলেই যেন মরিয়া রহিয়াছে। কি অদূরে কি সুদূরে কোথাও পাখীর ডাক শুনিতে পাই না। মানুষের বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক নাই। মানুষ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শীতে জড় সড় হইয়া পড়িয়া আছে অথবা বস্ত্রাভাবে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরাভ্যন্তরে কিম্বা পথপার্শ্বে পড়িয়া হিমঋতুর নিদারুণ মর্ম্ম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। রোগী রোগ ঝাড়িয়া রুগ্নশয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পৃথিবী হিমময়, যেন হিমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। জড় জগতের শক্তি, জড় জগতের শ্রী, জড় জগতের সৌন্দর্য্য সকলই বিলুপ্ত।

ক্রমে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে গমন করিলেন। তাঁহার নিস্তেজ মূর্ত্তি সতেজ ভাব ধারণ করিল। পৃথিবী হাড়ে হাড়ে তাপ অনুভব করিতে লাগিল।

এখন দেখ দেখি পৃথিবীতে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ফুটিয়াছে! যে অনন্ত-বিস্তৃত, কু-রূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশি সুন্দর আকাশ এবং সুন্দর পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সে বাষ্পরাশি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। উপরে তারকাখচিত নীলাকাশ, নীচে নীল সমুদ্র, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী, এবং প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত সরোবর হাসিতেছে। মৃত বৃক্ষ প্রাণ পাইয়াছে, তাহার প্রতি শাখা এবং প্রশাখা ছোট ছোট কচি কচি পাতায় আবৃত। সেই সকল পাতার ভিতর ছোট ছোট পাখী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মরা গাছ যেন একটী নবজাত শিশুর শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে গাছ অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে, কখনই মরিবে না। আজ যে দিকে চাই; সেই দিকেই সৌন্দর্য্য, সেই দিকেই জীবন-শক্তির রমণীয় স্ফূর্ত্তি। আজ মানুষ গৃহের দ্বার খুলিয়া বৃক্ষ, লতা, আকাশ সমুদ্রের শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছে। আজ শীতক্লিষ্ট কাঙ্গাল এবং কৃষক হাসিয়া কথা কহিতেছে। আজ রোগী রুগ্নশয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়া-হইয়াছে। আজ কীট, পতঙ্গ, পশু উন্মত্ত হইয়া খেলা করিতেছে। আজ

কি অদূরে কি সুদূরে সর্ব্বত্রই সুকণ্ঠ পক্ষী গলা ছাড়িয়া গীত গাহিতেছে; আর পৃথিবীর স্ফূর্ত্তি আকাশের স্ফূর্ত্তিতে মিশিয়াছে। আর এই আজি-কার তপনতাপজনিত অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির দিনে উদ্যানে, প্রাঙ্গণে, কাননে, অরণ্যে ফুট্ ফুট্ করিয়া রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া পড়িতেছে।

যে তাপ জড় জগতের প্রাণ, যে তাপে জড় জগৎ ফোটে, সেই তাপ ফুলেরও প্রাণ, সেই তাপে ফুল ও ফোটে। যে তাপের প্রভাবে জড় জগ-তের এত বাহ্য বিকাশ, এত বাহ্য রঙ্গ, সেই তাপের প্রভাবে ফুলেরও এত বাহ্য বিকাশ, এত বাহ্য রঙ্গ। ফুল তুমি এত জড়, তোমার ভিতর এত তাপ?

শুধু কি তাই? ফুল কি শুধু তাপোদ্ভূত, তাপগর্ভ জড়? ফুল আদর্শ জড়।

দেখ, সকল জড়ের এক রকম না হয় আর এক রকম রূপ আছে। কিন্তু ফুলের মতন রূপ কার আছে বল দেখি? প্রশস্ত সরোবরে যখন বড় বড় পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে, আর সেই পদ্মফুলে অসংখ্য ভ্রমর বসিয়া মধুপান করে, তখন দেখিলে মনে হয় না কি যে সরোবরের স্বচ্ছ জলে কত আগ্রীব-নিমজ্জিতা সুন্দরী কাল চুল এলাইয়া দিয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে আপন আপন রূপের কথা কহিতেছে? যখন চাঁপা গাছে চাঁপার কলিটি দেখা দেয়, তখন মনে হয় না কি যে জগতের আদর্শ গঠনটি প্রকাশ পাইয়াছে—ক্ষুদ্র, ঈষৎ দীর্ঘ, নিটোল, নিখুঁত? ঐ দেখ একটি লতা একটা সরলদ্রুম বেষ্টন করিয়া বৃক্ষটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছে। মন্দ মন্দ সমীরণে লতারাশি অল্প অল্প হেলিতেছে, দুলিতেছে। লতার গায় এক একটি গুচ্ছে কতকগুলি করিয়া ঈষৎ দীর্ঘ লাল ফুল ঝুলি-তেছে এবং বাতাসে অল্প অল্প নড়িতেছে। ঠিক বোধ হইতেছে যেন লতান্তরালে কত অনুপম রূপসী লুকাইয়া ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা করপল্লব গুলি বাহির করিয়া কি-জানি-কাহাকে খেলা করিতে ডাকিতেছে। ঐ দেখ ওখানে কতকগুলি কিংশুক বৃক্ষ ফুলে ছাইয়া পড়িয়াছে। ঠিক যেন

"আদীপ্ত বহ্নিসদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ
সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।

সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি
রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥”

ঐ স্বচ্ছসলিলা নদীর তীরে ঐ রমণীয় উদ্যানে বেল, যূঁই, মল্লিকা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলগাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সকলগুলিই সুন্দর, হাস্যময়, রূপের ছটায় চারিদিক আলো করিয়া রহিয়াছে। অল্প অল্প বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া এ ওর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে। সকলের মধ্যস্থলে একটা উচ্চ গোলাবের ডালে একটা বড় গোলাব ফুটিয়া রহিয়াছে—হেলিতেছেও না দুলিতেছে ও না। যেন রূপসীর সভা হইয়াছে—সকল রূপসী হাবভাব প্রকাশ করিয়া রূপের চটক বাড়াইতেছে, কেবল মধ্যস্থলে একটা ক্লিওপেট্রা রূপ গর্ব্বে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার ঐ দেখ নদীর অপর পারে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সুদূর বিস্তৃত কানন। কাননে কোথাও অসংখ্য কর্ণিকার বৃক্ষে অসংখ্য কর্ণিকার ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য জবাবৃক্ষে অসংখ্য জবা ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য অশোক বৃক্ষে অসংখ্য অশোক ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য টগর বৃক্ষে অসংখ্য টগর ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষও অসংখ্য ফুলও অসংখ্য। বৃক্ষও বিবিধ, ফুলও বিবিধ। বৃক্ষও নানাজাতীয় ফুলও নানা বর্ণের। যেন একখানা সুবিস্তৃত সবুজ বস্ত্রে ভারতের খ্যাতনামা শিল্পী নানা বর্ণের রেশমী সুতায় নানাবিধ ফুল তুলিয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত ছড়াইয়া রাখিয়াছে। অথবা যেন মিল্টন কর্ত্তৃক চিত্রিত সেই সূর্য্যলোকস্থিত নানা রত্নখচিত সুদূর প্রসারিত মহাদেশ :—

“ If metal, part seems gold, part silver clear ;
If stone, carbuncle most or chrysolite,
Ruby or topaz, to the twelve that shone
On Aaron's breastplate, and a stone besides
Imagin'd rather oft than elsewhere seen.”

ফুল, তোমার রূপের কথা আর কি বলিব। তোমার রূপেই পৃথিবী রূপবতী। তুমি রূপের উৎস, এবং সেই জন্যই মুগ্ধ Wilhelm অতুল রূপ

দেখিতে দেখিতে ভাবিয়াছিল ;—"As Minerva sprang in complete armour from the head of Jove, so does this goddess seem to have stept forth with a light foot, in all her ornaments, from the bosom of some flower."

আবার, ফুল, তোমার রূপ যেমন, রস তেমনি। তুমি অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তোমার রসের পরিমাণ নাই। তোমার রসে পৃথিবী ডুবিয়া রহিয়াছে। তোমাকে দেখিলে বোধ হয় না যে তোমার বেশী রস আছে। কিন্তু তোমার ভিতর প্রবেশ করিলে, রসের সমুদ্রে পড়িতে হয়। ঐ দেখ দেখি একটী মধুমক্ষিকা ঐ ক্ষুদ্র যুঁই ফুলটীর রস কত খাইয়া যাইতেছে আবার আসিয়া কত খাইতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিয়া কত খাইতেছে। আবার এদিকে দেখ দেখি একটী ক্ষুদ্র গোলাব ফুলে কত মৌমাছি বসিয়া রসপান করিতেছে। ঐ দেখ মৌমাছিগুলা রস পান করিয়া উড়িয়া গেল ; কিন্তু আর একদল মৌমাছি আসিয়া রস পান করিতে বসিল ; দেখ, দেখ, কত মৌমাছির দল রস পান করিতে আসিতেছে, রস পান করিয়া যাইতেছে। তবুও ত ঐ ক্ষুদ্র গোলাবের রসের ভাণ্ডার ফুরাইতেছে না। আর এ রস কি সামান্য রস ? এই রসের নামই ত মধু। ফুলের মধু কত মিষ্ট তা কে না জানে ? ফুলের মধু যে খায় সে কি কখন ভুলিতে পারে ? আবার ফুলের রস যে শুধু মিষ্ট তা নয়। ফুলের রস মাদক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ফুলের রসে সুরা প্রস্তুত হয়। সেই সুরা পান করিয়া মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, আপন-পর জ্ঞানশূন্য হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, কর্দ্দমকে বিশুদ্ধ শয্যা মনে করে, পাপকে পুণ্য বলিয়া আলিঙ্গন করে, সংসারক্ষেত্রে উন্মত্ত পশুর ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। ফুল, তুমি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তুমি বিষম প্রতারক। তোমাকে দেখিলে বোধ হয় তুমি নীরস। কিন্তু যে তোমার সহিত আলাপ করে সে তোমার রস পান করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং তোমার রস পান করিয়া মুগ্ধ এবং নেশায় বিহ্বল হইয়া মধুকলসমগ্ন মধুকরের ন্যায় ইহকাল এবং পরকাল হারাইয়া থাকে। তাই বলি, ফুল, তুমি রসের ভাণ্ডার এবং তোমার রসের মতন রস জগতে আর কিছুতেই নাই।

তোমার গন্ধই বা কি চমৎকার! তোমাকে আঘ্রাণ করিলেই শরীরে কি একটা অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। বুঝিতে পারা যায় না যে বিশেষ কিছু অনুভব করিলাম, অথচ সর্ব্বশরীরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। আর যখন সেই পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়—যখন সেই চমৎকার সৌরভে শরীর উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তখন শরীর, মন, প্রাণ সমস্তই সেই পরিবর্ত্তিত ভাবে, সেই চমৎকার সৌরভে মজিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, গলিয়া যায়। তখন এই জগতে শরীর মন এবং প্রাণ আর কিছুই অনুভব করে না, আর কিছুই অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। ফুল, যখন তোমার কোমল সৌরভ আঘ্রাণ করা যায়, তখন সমস্ত শারীরিক শক্তি যেন অল্পে অল্পে হ্রাস প্রাপ্ত হয়—যে শারীরিক তেজ মহাবীরের অসীম বিক্রমের উৎস স্বরূপ, সেই তেজ অল্পেঅল্পে নিভিতে থাকে—যে সচেতন ভাব জীবাত্মার প্রধান ধর্ম্ম এবং লক্ষণ সেই সচেতন ভাব অল্পে অল্পে বিলুপ্ত হইয়া আইসে। ফুল, তোমার কোমল সৌরভের কি অসাধারণ শক্তি! বোধ হয় যদি মানুষ সর্ব্বক্ষণ তোমার সৌরভ আঘ্রাণ করে তবে চিরকালই এক রকম মরিয়া থাকে! ক্ষুদ্র ফুল, তোমার কোমল সৌরভের শক্তি যথার্থই কৃতান্তের শক্তির ন্যায়। আবার তোমার সৌরভের বৈচিত্রই বা কত। চাঁপার উগ্র গন্ধ এবং শিরীষের কোমলতম অপেক্ষা কোমলতর গন্ধ—এই দুই গন্ধের মধ্যে কত রকমের গন্ধ আছে কে ঠিক করিবে? এবং সেই সকল গন্ধের মধ্যে প্রত্যেকেই যে মনোমধ্যে এক একটী বিশেষ স্পৃহার উদ্রেক করে তাহাই বা কে না জানে? কে না জানে যে ফুলের যত রকম সৌরভ ফুল তত রকম লালসা উৎপন্ন করিয়া থাকে? ফুল, তোমার সৌরভের গুণে তুমি ঘোর মায়াবিনী —ঘোর কুহকিনী! ফুলের সৌরভ কি মিষ্ট, কি মাদক! যখন বিস্তীর্ণ পুষ্প কাননে মন্দ মন্দ বাতাস বহে এবং পুষ্পের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দিগ্‌দিগন্ত যথার্থই মধুময় হইয়া যায়, যথার্থই নেশায় ভোর হইয়া উঠে। নিদারুণ গ্রীষ্মের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলিয়া যাইতে থাকে তখন ফুলের গন্ধ শরীরে যেন মধু ঢালিয়া দেয়, গ্রীষ্মের জ্বালা যেন সেই মধুর রসে বিলীন হইয়া যায়। ফুলের সৌরভ একটীমাত্র ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় হইয়াও অনেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। তাই

বলি, ফুল, তোমার গন্ধ কি চমৎকার! তোমার গন্ধের গুণে তুমি ঐন্দ্রজালিক!

ফুল তোমার স্পর্শ কি সুখকর! জগতে কোমল পদার্থ অনেক আছে। শ্যামল দূর্ব্বাদল অতি কোমল। শুভ্র কার্পাস অতি কোমল। পক্ষীর পক্ষান্তরালস্থিত রোমাবলী অতি কোমল। ভারত শিল্পের গৌরব 'সব্‌নাম' অতি কোমল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটীরই স্পর্শ ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখপ্রদ নয়। কেন? শিরীষ অতিশয় কোমল, মাধবী অতিশয় কোমল তা জানি। কিন্তু মাধবীর কোমলতা কি শিরীষের কোমলতা ইহাদের কোমলতা অপেক্ষা যে বেশী তাহা বলিতে পারি না। তবে কেন ফুলের স্পর্শ ইহাদের স্পর্শাপেক্ষা এত বেশী সুখকর? কেন তাহা জানি না, কিন্তু বেশী সুখকর তাহা জানি। ইহাও জানি যে অনেক ফুল অপেক্ষা কার্পাস প্রভৃতি পদার্থ অনেক গুণে কোমল কিন্তু তাহাদের স্পর্শ সেই সকল ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখকর নয়। আর ইহা জানি বলিয়া বলিতে পারি যে, ফুলে এমন কোন গুণ আছে, যাহা অন্য কোমল পদার্থে নাই। সে গুণ টুকু কি? যিনি ফুল স্পর্শ করিয়াছেন তিনি কোমলতা ছাড়া আরো এক প্রকার ভাব অনুভব করিয়াছেন। কোমলতার ন্যায় সে ভাবটুকু শরীরে অনুভূত হয় না, সে ভাবটুকু কেবল প্রাণে অনুভূত হয়। তাই ফুলের স্পর্শে প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের বা রসের সঞ্চার হয় আর মনে হয় বুঝি ফুলের কোমলতার সহিত আরো কত কি মিশ্রিত আছে। মনে হয় বুঝি ফুলের একটা প্রাণ আছে, ফুলের একটা ভাব আছে, ফুলের একটা মোহিনী মন্ত্র আছে—ফুল আমাকে সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত করিল, সেই ভাবে ভাবময় করিল, সেই মন্ত্রে মুগ্ধ করিল। ফুল ছাড়া আর কোন পদার্থে সে প্রাণ নাই, সে ভাব নাই, সে মন্ত্র নাই। তাই ফুলের স্পর্শ সকল স্পর্শাপেক্ষা এত সুখকর, এত মোহকর, এত কোমল, এত কল্পনাবৎ। আর সেই জন্যই কল্পনাময় মহাকবি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত কল্পিত সুন্দরীর নিমিত্ত ফুলের শয্যা রচনা করিয়াছেন *।

* Midsummer Night's Dream.

ফুল, তুমি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, সকল রকমেই শ্রেষ্ঠ। রূপ দেখিতে হইলে মানুষ তোমারই রূপ দেখে; রস পান করিতে হইলে তোমারই রস পান করে; গন্ধে মজিতে হইলে তোমারই গন্ধে মজে; স্পর্শ সুখে গলিতে হইলে তোমাকেই স্পর্শ করে। তাই বলি তুমি আদর্শ জড় এবং আদর্শ জড় বলিয়াই জগতের জড় প্রকৃতির মূল মন্ত্র, মূল শক্তি, প্রাণের প্রাণ। হিমাচলের মহারণ্যে মহাদেব যোগমগ্ন। সহসা মহারণ্যে বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিল। অশোক ফুটিল, কর্ণিকার ফুটিল, পলাশ ফুটিল, আরো কত ফুল ফুটিল। যেমন ফুল ফুটিল অমনি—

মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥
গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ
কিঞ্চিৎসমুচ্ছ্বাসিত পত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিত নেত্রশোভি
প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥

ফুল, তুমি আদর্শ জড় বলিয়া, জড় প্রকৃতি তোমাকে লইয়া উন্মত্ত। বৃক্ষ বল, লতা বল, পর্ব্বত বল, সরোবর বল, নদ বল, নদী বল, সকলেই তোমার রূপের তৃষ্ণায় কাতর, সকলেই তোমার রূপের দোহাই দিয়া রূপের হাটে পরিচিত, সকলেই তোমার স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধাবান্। যেখানে তুমি নাই সেখানে জড় জগৎ নাই বলিলেই হয়, কেন না সেখানে রূপের ছটা নাই, রসের স্রোত নাই, সৌরভসুরা নাই, স্পর্শসুখ নাই। যেখানে তুমি নাই সেখানে হাসি নাই, উল্লাস নাই, সঙ্গীত নাই, তৃষ্ণা নাই, পরিতৃপ্তি নাই,—কেন না সেখানে কেহই ফোটে না, কেহই নাচে না,

পাখী গীত গায় না, মৌমাছি মধুপান করে না। তাই বলি, ফুল, তুমি জড়-প্রকৃতির প্রাণ। এ কথাটা কিছু তোমার পক্ষে নিন্দার কথা নয়। এ জগতে যে কাহারও প্রাণস্বরূপ হয়, জগৎ তাহাকে চায়, জগতে তাহার কাজ আছে। সে যে রকমেরই প্রাণ হউক, উচ্চ প্রকৃতির অথবা নীচ প্রকৃতির, জগতের প্রাণ তাহার প্রাণের সহিত জড়িত—তাকে ছাড়িলে জগৎ বাঁচে না। তাই বলি, ফুল, তুমি যদিও জড় প্রকৃতির প্রাণ, তথাপি তুমি নিন্দনীয় নহ—তথাপি তুমি অনেক সুখের কারণ, অনেক ভোগের উপাদান, অনেক সম্পদের মূল। পৃথিবীতে যতক্ষণ জড়ত্ব আছে, যতক্ষণ জড় প্রকৃতিতে ভোগলালসা আছে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমাকে চায়। কিন্তু তোমার কতকগুলি গুরুতর দোষ আছে। তুমি বড় হাল্কা, কেন না তুমি মোহপরবশ। তুমি আদর্শ জড়, কিন্তু তুমি তোমার পদমর্য্যাদা বুঝ না। তোমার আত্মা নাই, হৃদয় নাই, রুচি নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই। পৃথিবী তোমায় চায় বলিয়া তুমি পৃথিবীর সহিত এত মেশ কেন, পৃথিবীকে এত মাতাও কেন? ঐ দেখ দেখি, তুমি ওখানে ফুটিয়া রহিয়াছ আর কত ভ্রমর, কত মৌমাছি, তোমার মধুপান করিতেছে, মধুপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় তোমাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবার তোমার মধুপান করিতেছে, আবার আরও উন্মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ দেখ একটি ক্ষুদ্র পক্ষী ঘৃণা করিয়া তোমাকে তাহার ক্ষুদ্র পদ দ্বারা আঘাত করিয়া উড়িয়া গেল। কিন্তু তুমি একটিবার মাত্র নড়িয়া আবার স্থির হইয়া বসিলে এবং তোমার নির্লজ্জ ভ্রমর এবং মৌমাছিগুলা আবার ঝঙ্কার করিয়া তোমার মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। মধু আছে বলিয়া তাহা কি এই রকম করিয়াই মুগ্ধ হইয়া বিলাইতে হয়? তোমার মধু আছে বলিয়া তুমি নিজে নির্লজ্জ এবং উন্মত্ত এবং যে তোমার কাছে আসে তাহাকেই তুমি নির্লজ্জ এবং উন্মত্ত করিয়া তোল। তুমি বড় হালকা, তুমি বড় অপদার্থ। তুমি নদীর স্রোত, তোমাতে সমুদ্রের মহত্ত্ব, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য নাই। তুমি মর না কেন?

ফুল, পৃথিবী তোমাকে চায়, তুমি পৃথিবীর একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ,

কিন্তু তুমি আপনার রসে এমনি ডুবিয়া থাক যে তোমার নিজের মর্য্যাদা তোমার মনে থাকে না ; তুমি যে জড় এবং ক্ষণস্থায়ী তাহাও তোমার মনে থাকে না। তাই তোমার এত দুর্দ্দশা, এত অপমান, এত অধঃপতন। মনে কর দেখি কাল তুমি কি ছিলে। কাল তুমি মনোহর গুচ্ছাকারে মনোহর হর্ম্মে মনোহর পুষ্পাধারে সযত্নে, সাদরে রক্ষিত। কাল তোমাকে যে দেখিয়াছে সেই তোমার গুণগান করিয়াছে, তোমাকে কত আদর করিয়াছে, কত স্নেহের, কত প্রীতির, কত গৌরবের বস্তু বলিয়া মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। অথবা, কাল তুমি সিংহাসনাধিরূঢ়া মহারাণী। তোমাকে একটিবার মাত্র দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক মাথা ফাটাফাটি করিয়াছে। কাল তোমার স্তাবকের সংখ্যা ছিল না। তোমার একটি কটাক্ষের কামনায় কত লোক রক্তপাত করিয়াছে। কাল তোমার মজলিস্‌ই বা কি আর দিল্লীর বাদশাহের মজলিস্‌ই বা কি। কিন্তু আজ তুমি কোথায়? আজ তোমার সেই রাজ-প্রাসাদ কোথায়? তোমার সেই স্ফটিকময় সিংহাসন কোথায়? তোমার সেই স্তাবকবৃন্দ কোথায়? তোমার সে আদর কোথায়, সে গৌরব কোথায়? আজ তুমি ধূলিধূসরিত অঙ্গে ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছ, কাল যাহারা তোমার গুণগান করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, কাল যাহারা তোমার কটাক্ষ লাভার্থ রক্তপাত করিয়াছিল, আজ তাহারা তোমাকে চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আজ তুমি পৃথিবীর ধূলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেন, ফুল, তুমি তোমার আপনার রসে এত ভিজিয়া লোককে এত ভিজাও? জান না কি যে, যে বেশী রস বিতরণ করে সে নিজে শেষ শুকাইয়া মরে? তাই বলি, ফুল, সাবধান হইও। রসে অত ডুবিয়া থাকিও না; তাহা হইলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া, তোমাকে ভিক্ষুকের ও অধম হইতে হইবে। তোমার রসই তোমার সর্ব্বনাশের গোড়া। তোমার রসের গুণেই তুমি এত মুগ্ধ, এত অন্ধ। তাই বলি, ফুল, তোমার রসকে তুমি আপনি ঘৃণা করিতে শিখিও।

আর, ভাই সকল, তোমাদিগকেও বলি, তোমরা ফুল লইয়া ক্রীড়া করিও না। ফুল আদর্শ জড়, ফুল জড়প্রকৃতির প্রাণ, ফুলের মধু বড় মোহকর, ফুলের মধুতে বিষ আছে। তপনতাপজনিত ফুলে যে অগ্নি আছে তাহাতে

ফুল আপনি পুড়িয়া মরে এবং সকলকেই পোড়াইয়া মারে। যদি উন্নত হইতে চাও তাহা হইলে ফুলকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু মনে রাখিও যে ফুল জড়, ফুলে জড়ত্ব আছে, ফুল জড়ত্ব পোষণ করিতে ভাল বাসে। অতএব ফুলের কাছে সাবধানে থাকিও। এবং ফুল যাহাতে জগতের জড়ত্ব বৃদ্ধি করিতে না পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিও।

ফল ।

জীবন ও পরলোক।

মৃত্যুতেও মৃত্যু নাই, ইহলোকের পর পরলোক আছে—মানুষ চির-কাল এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে, বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, আশা করিয়া আসিতেছে।

এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, এই আশা কি অমূলক? মৃত্যু কি সত্যই মৃত্যু? ইহলোকের পর কি পরলোক নাই?

মোটা মুটি বলিতে গেলে, পরলোকবাদের তিনটি হেতু আছে। প্রথম বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা; দ্বিতীয়, কর্ম্মফলভোগ; তৃতীয়, আত্মার অমরতা। মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে মৃত্যু হইলে সমস্তই লয় হইবে, এইরূপ ভাবিতে মানুষের যথার্থই হৃৎকম্প হয়। কিন্তু মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলবতী বলিয়া মানুষ মরিয়াও মরিবে না, ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে থাকিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহাকে মরিতে না হয়। কিন্তু মরিতে ইচ্ছা হয় না বলিয়া মানুষ অমরতা লাভ করে না। তবে মনুষ্যের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহাকবি মিল্টন লিখিয়াছেনঃ—

Who would lose,
Though full of pain, this intellectual being,
Those thoughts that wander through eternity,
To perish rather, swallow'd up and lost
In the wide womb of uncreated night,
Devoid of sense and motion?

মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার যে বলবতী ইচ্ছা আছে মহাকবি তাহাই প্রধানতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে একটু যুক্তিরও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যেন তর্ক করিতেছেন যে, উন্নত জ্ঞানময় অস্তিত্ব এবং অনন্তভেদী অনন্তবিহারী চিন্তার ন্যায় উত্তম পদার্থ কি লয় হইতে পারে ? আমরা যতদূর বুঝি এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা আমাদিগকে যতদূর বুঝাইতে পারিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ভাবন করা এবং অধমকে পরিশুদ্ধ করিয়া উত্তমে পরিণত করা জাগতিক শক্তির অভীষ্ট কার্য্য। কিন্তু উত্তমও ত বিনষ্ট হয় ? সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহও ত ছাই হইয়া যায়? তবে কেমন করিয়া জোর করিয়া বলি যে চিন্ময় অস্তিত্ব উত্তম জিনিস বলিয়া তাহার বিনাশ নাই ?

দ্বিতীয় কারণ, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগ, প্রথম কারণ অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মের ফলভোগ অপরিহার্য্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আগুণে হাত দিলে হাত অবশ্যই পুড়িবে এবং দুর্নীতি অনুসরণ করিলে জীবন অবশ্যই কদর্য্য হইবে। কিন্তু কর্ম্মের ফলভোগ আছে বলিয়া পরলোকও আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। অনেক অধার্ম্মিক দুর্নীতিপরবশ লোককে ইহলোকে সুখ-ভোগ করিতে দেখা যায় বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে তাহারা পর-লোকে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে অধার্ম্মিক এবং দুর্নীতিপরবশ হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব ও বিকৃত হইয়া যায়; বিশাল এবং বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব লাভে যে উৎকৃষ্টতম সুখ ও সৌন্দর্য্য মানুষ তাহা ভোগ করিতে পায় না—মানুষ তাহাতে বঞ্চিত হয়। তাহাই কি দুষ্কর্ম্মান্বিত মানুষের দুষ্কর্ম্মের যথেষ্ট ফলভোগ নয় ? অনেক ধার্ম্মিক লোক ক্লেশ পাইয়া মরে সত্য ; কিন্তু ধার্ম্মিকের সুখ মনে, সম্পদে নয়। অতএব কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত পরলোক কত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আরো এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় যে সুখ দুঃখের কারণ অনেক স্থলে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে উদ্ভূত হয়, লোকের নিজের নিজের সৃষ্ট নয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ফল-ভোগের নৈতিক হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরলোকেরও প্রয়ো-

জন থাকে না। তবে যদি বল যে প্রত্যেক সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম শক্তির ফল এবং শক্তির বিনাশ নাই, তাহা হইলে কথাটি কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। কেন না তাহা হইলে কর্ম্মের ফল বিনষ্ট হইতে পারে না এবং অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। কিন্তু বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে তাহা হইলেও একটু গোল থাকে। কেন না কর্ম্মের ফল শক্তিরূপ বলিয়া যদিও বিনষ্ট হইবার নয়, তথাপি কর্ম্মফলরূপ শক্তি যে কর্ম্মকর্ত্তাতেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও অধিকার করিবে না, এমন কোন কথাই নাই। কথা নাই সত্য। কিন্তু কর্ম্মফল কর্ম্মকর্ত্তাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকে অধিকার করিলে, সেই অপর ব্যক্তিই কর্ম্মকর্ত্তার পরলোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাহা ও বড় সামান্য কথা নয়। সে পরলোক ও ত তুচ্ছ পরলোক নয়। তোমার কর্ম্মের ফলে তুমি যদি তোমার সন্তানসন্ততির সুখ দুঃখের নিয়ন্তারূপে সেই সন্তানসন্ততিতে থাক তবে তোমার পরলোক প্রকৃত পক্ষেই পরলোক, বড় গুরুতর পরলোক। বস্তুতঃ ইদানীন্তন ইউরোপীয় দার্শনিকেরা কর্ম্মফলবাদ হইতে এই প্রকারেই পরলোকবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। যথা জর্ম্মাণ দার্শনিক ফেকনরঃ—*

Every person, in his lifetime, takes hold of, and grows into the minds of others, by his words and works, spoken, written, or acted. While Göethe was still alive thousands of his cotemporaries bore within them some sparks from the light of his genius, which afterwards kindled up into new light. While Napoleon was still alive, his powerful genius exercised its influence on the whole generation almost, and when the one and the other died, the germs which had fallen into other minds, did not die with them, they grew, and developed

*Life after Death নামক গ্রন্থ দেখ।

themselves, constituting in their total an individual being, as their origin had been from an individual.

কর্ম্ম ও শক্তি একই বস্তু; শক্তির বিনাশ নাই। অতএব ঠিক পৌরাণিক পদ্ধতিতে না হউক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরলোক কর্ম্মফলবাদের অপরিহার্য্য ফল। কিন্তু লোকে সামান্যত যাহাকে পরলোক বলে, এ সে পরলোক নয়। না হইলেও এ কথা বলিতে পারি যে লোক সাধারণের শিক্ষার যত উন্নতি হইবে এই সিদ্ধান্ত ততই তাহাদের হৃদয় অধিকার করিবে; ততইতাহাদের ধর্ম্মনীতি পরলোক মূলক হইবে; ততই পৃথিবীতে ইহলোক এবং পরলোক, ভূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িবে এবং কালের স্রোত ততই প্রেমের স্রোত হইয়া দাঁড়াইবে।

আত্মা একটী স্বতন্ত্র জিনিস কি না, এবং দেহ মন সমস্ত নষ্ট হইলে আত্মা জীবিত থাকে কি না একথার মীমাংসা কি? আমার বিশ্বাস যে দেহান্তে আত্মা জীবিত থাকে। বহুকাল হইতে মানুষ সেইরূপই বুঝিয়া আসিতেছে এবং বুঝিবার হেতুও দর্শাইয়া আসিতেছে। বিশেষ প্রাচীন ভারতবর্ষে যোগশাস্ত্রদ্বারা আত্মার স্বাধীনতা এবং অমরতা এক রকম প্রতিপন্ন হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আধুনিক spiritualism-এও তাহাই হইতেছে। অপরপক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকারে জীবন-তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন তাহা বিবেচনা করিলে দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন, যেখানে স্নায়ু অথবা স্নায়ব প্রণালী নাই সেখানে চিন্ময় জীবন নাই। মরিলে স্নায়ব প্রণালী ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব মরিলে আত্মা বা চিন্ময় অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। একথার মূলে একটি বিষম ভ্রম আছে। দেহ হইতে আত্মা পৃথক পদার্থ, জড় হইতে চৈতন্য পৃথক পদার্থ, এই বিশ্বাসই সেই ভ্রম। কি এদেশের কি ইউরোপের সকল দেশের উন্নত দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে জড় পদার্থ এবং চৈতন্য সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ এরূপ বুঝিবার কোন যুক্তি বা প্রমাণ নাই। উভয়ে একই পদার্থ, অবস্থা বিশেষে চৈতন্য জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাই প্রকৃত কথা। অতএব স্নায়ব-প্রণালী-সংযুক্ত চৈতন্য চৈতন্যের একটি অবস্থা মাত্র। এবং স্নায়ব প্রণালী হইতে বিযুক্ত চৈতন্য অসম্ভব পদার্থ নয়।

তাই বলি যে দেহের বিনাশ হইলে আত্মা থাকে। কেন না জগতে মৃত্যু নাই, জগতে যাহা একবার হয় তাহা আর মরে না। জগতে যে মৃত্যু নাই, জীবন-তত্ত্ব অনুশীলন করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সংক্ষেপে তাহাই করিব।

জীবন কি? অথবা জীবন কিসে থাকে, কিসে হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কৃতকার্য্য না হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে যাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এক একটি পদার্থ বিশেষকে জীবনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে জীবন তাপ বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন তড়িৎ বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন স্নায়ব প্রণালী বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন একটি স্বতন্ত্র শক্তি বিশেষ। কিন্তু একটু নিবিষ্ট ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে জীবন কোন একটি পদার্থ বা শক্তি বিশেষ নয়; জগতে যাহা কিছু আছে সবই জীবন। যাহা না থাকিলে বা না পাইলে জীবন থাকে না তাহাই জীবন। স্নায়ব প্রণালী না থাকিলে মানুষের জীবনের ক্রিয়া হয় না সত্য। কিন্তু স্নায়ব প্রণালী থাকে কেমন করিয়া? পানাহারের জোরেই স্নায়ব-প্রণালী থাকে কি না? যদি তাহা হয়, তবে যাহা পানাহার করিলে স্নায়ব-প্রণালী থাকে তাহাকেই জীবন বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না? দেহে যত ধাতু বা মৌলিক পদার্থ (elementary substance) আছে সকলই জীবন এবং সেই সকল ধাতু বা মৌলিক পদার্থ যাহাতে আছে তাহাই জীবন। আবার মানুষ ছাড়িয়া পশু, পশু ছাড়িয়া পক্ষী, পক্ষী ছাড়িয়া সরীসৃপ, সরীসৃপ ছাড়িয়া কীটপতঙ্গ, কীটপতঙ্গ ছাড়িয়া মৎস্য, মৎস্য ছাড়িয়া উদ্ভিদ, এই রূপ পৃথিবীতে যত জীবিত বস্তু আছে, সকলের পুষ্টিসাধক জীবন-পোষক বস্তুই জীবন। যখন অনাহারে মৃত্যু হয় তখন যাহা আহার করা যায় তাহাই জীবন। যখন তৃষ্ণার অশান্তিতে মৃত্যু হয়, তখন যাহা পান করা যায় তাহাই জীবন। যখন শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় তখন যাহা নিশ্বাসিয়া

লওয়া যায় তাহাই জীবন। কিন্তু জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা কাহারো আহারীয় নয়, পানীয় নয়, অথবা নিশ্বাসিয়া লইবার নয়? অতএব জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা জীবন নয়? ইহাই জীবন-তত্ত্ব বুঝিবার প্রকৃতি পদ্ধতি। এবং এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জগতে এমন কিছুই নাই যাহা জীবন-সাধক এবং জীবন-পোষক নয়,—ধূলাও জীবন, মৃত্তিকাও জীবন, জলও জীবন, সূর্য্যালোকও জীবন, চাঁদের সুধাও জীবন, দুগ্ধও জীবন, মাংসও জীবন, গোধূমও জীবন, বাতাসও জীবন, পাথরও জীবন, সাপের বিষও জীবন, পচা মৃতদেহও জীবন। বাস্তবিক জগতে মৃত বস্তু বা মৃত্যু নাই—সকলই জীবন। শুধু তাও নয়। জগতে জীবিত ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষ নাই। জগতে যাহা কিছু আছে সমস্ত লইয়া একটী জীবন---যেন সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুতে দুগ্ধস্থিত জলের ন্যায় জীবন হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে, ওতপ্রোত ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। যেন সমস্ত জগৎ একটি বিপুল জীবন্ময় উচ্ছ্বাস—সমস্ত জগৎ একটি বিশাল জীবন। জগতে যাহা কিছু আছে, সেই বিশাল জীবনের অন্তর্ভূত—সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমার জীবন, তোমার জীবন, সকলেরই জীবন সেই বিশাল জীবনের অন্তর্ভূত। আবার সেই বিশাল জীবনের দৈর্ঘ্য ভূতকালেও অসীম, ভবিষ্যতেও অসীম। অথবা তাই বা কেন বলি? ভূত ভবিষ্যতের বিভাগ কোথায়? জগতের বিশাল জীবনে ছেদ কোথায়? ছেদ হয় কেমন করিয়া? না, জগতের বিশাল জীবনে ছেদ নাই, ছেদ হইতেও পারে না। জগতের বিশাল অনন্ত জীবনের নাম অসীম অনন্ত জগৎ। অসীম অনন্ত জগতের নাম বিশাল অনন্ত জীবন। অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোক ও পরলোকের প্রভেদ কি? অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোকও আছে, পরলোকও আছে, সব লোকই আছে। যে বলে, অসীম অনন্ত জীবনে পরলোক নাই, জীবন কাহাকে বলে সে জানে না, জগৎ কাহাকে বলে সে জানে না। এই জীবনরূপী জগতে ইহলোকের পর পরলোক থাকিবেই থাকিবে। কেন না যে খানে জীবন বই আর কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যুর স্থান নাই।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল জীবনে আমিও জীবন, তুমিও জীবন।

আমার জীবন ও সেই বিশাল জীবনে জীবিত, তোমার জীবন ও সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমিও সেই বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তুমিও সেই বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পার না। তবে আইস আমরা সেই বিশাল জীবনে মরিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে মাতালের ন্যায় মাতিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে প্রেমিকের ন্যায় মজিয়া থাকি। সেই মৃত্যুতেই তোমারও প্রকৃত জীবন, আমারও প্রকৃত জীবন।

অতএব পরলোক আছে কি না, পরলোকে কি ভাবে থাকিব, এ সকল কথা লইয়া গোল করিবার প্রয়োজন কি? যেখানে মৃত্যুই নাই সেখানে দেহত্যাগ করিয়া থাকিব কি না, কেমন করিয়া থাকিব, এ রকম গোলমাল না করিয়া থাকিতেই হইবে জানিয়া যাহাতে ইহলোকের অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় থাকিতে পার সেই চেষ্টাই কর না কেন? এই-আমি পরলোকে থাকিব কি না এ সকল কথা লইয়া ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? আমার যাহা কিছু আছে সবই থাকিবে ইহা যদি বুঝিয়া থাক তবে কি আকারে সে সব থাকিবে এ প্রশ্নের মীমাংসায় অনর্থক কালহরণ না করিয়া যাহাতে সে সব পরলোকে উন্নত অবস্থায় থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করাই তোমার ইহলোকের প্রধান কাজ।

ইহলোক ও পরলোক।

আমি এই রূপ বুঝি যে লৌকিক অথবা পৌরহিত্য-প্রধান হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে সকলেই পরলোককে ইহলোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে পৃথক বিবেচনা করে। এবং সকল ধর্ম্মগুলিতেই ঈশ্বর প্রধান পদার্থ এবং হয় পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নয় সুদূরস্থিত। খ্রীষ্ট এবং মুসলমান ধর্ম্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; লৌকিক হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও পৃথিবী হইতে সুদূরস্থিত। যে ধর্ম্মের আরাধ্য বস্তু পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র বা সুদূরস্থিত, সে ধর্ম্মের পরলোক কাজে কাজেই ইহ-লোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার ফল বড় গুরুতর, অনেক স্থলেই অতিশয় শোচনীয়। কারণ, যেখানে ইহলোক হইতে পরলোক সুদূর বা স্বতন্ত্র, সেখানে মানুষ পরলোকের নিমিত্ত ইহলোক উপেক্ষা করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকলেই পারলৌকিক সুখের আশায় ইহলোকের প্রতি প্রকৃত আস্থাহীন। বস্তুতঃ, দেখা যায় যে ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সংসারের প্রতি অনাস্থাই পরলোকের প্রতি আস্থা এবং পরলোকের প্রতি চূড়ান্ত আস্থার অর্থ চূড়ান্ত সাংসারিক বৈরাগ্য। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টীয়, কি মুসলমান ধর্ম্মে, সন্ন্যাসীই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং পরলোকের প্রধান অধিকারী। কিন্তু পরলোকের নিমিত্ত ইহলোকের প্রতি অনাস্থা করিলে একটা না হয় আর একটা বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে ইহলোকের প্রতি অনাস্থা প্রবল ছিল বলিয়া সংসারপ্রিয় ইউরোপ ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন, যে রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রধান মোহান্ত পোপের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশীয়েরা প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব ঘটাইয়াছিল।

কথাটি ঠিক নয়। আমার বোধ হয় যে বিপ্লবের নিগূঢ় অর্থ এই যে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপবাসীরা, তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতি-গুণে, সংসার অথবা ইহলোক প্রিয়, এবং সেই জন্য তাহারা দক্ষিণ ইউরোপের পরলোক-প্রধান ধর্ম্মনীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, তাহার ফল এই হইয়াছে যে, প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী এবং রোমানক্যাথলিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর শত্রুতায় ইউরোপ রাক্ষসের রাজ্য অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্মও পরলোক প্রধান। কিন্তু দেখ আজ ইহলোকে হিন্দুদিগের কি অবস্থা! মুসলমান ধর্ম্মে পরলোক অনেকাংশে ইহলোকের সদৃশ বটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মহম্মদের ঐহিক স্পৃহার বলে মুসলমানের পরলোক মুসলমানের ইহলোক অপেক্ষাও জঘন্য।

ফল কথা এই যে, ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে পার্থক্য, শুধু মানুষের অনিষ্টের হেতু নয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়মেরও বিরুদ্ধ। আগেকার অপেক্ষা এখন লোকসাধারণ এই তথ্যটি বেশী বুঝিয়াছে যে, জগতে কোন অবস্থার লয় নাই এবং প্রত্যেক অবস্থা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সম্পূর্ণ অনুযায়ী। অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থা এবং অস্তিত্বের বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদ-শূন্যতা স্বভাবের একটি প্রধান নিয়ম। অতএব পরলোককে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণ রূপে অস্বাভাবিক ক্রিয়া এবং সেই জন্যই এত অনিষ্টের মূল। পরলোককে ইহলোক হইতে ভিন্ন করা যে যথার্থ ন্যায়-বিরুদ্ধ এবং অস্বাভাবিক ক্রিয়া তাহার একটি পরিষ্কার প্রমাণ আছে। হিন্দু বল, মুসলমান বল, খ্রীষ্টান বল, সকলেই ইহলোকে পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। সকলেই যাগযজ্ঞ, দানধ্যান, ঈশ্বরের চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে বিশিষ্টরূপে নিবিষ্ট থাকিয়া পরলোকবাসের উপযোগী হইতে চেষ্টা করে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাইট, সত্তর বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করে। কিন্তু এতকাল ধরিয়া এত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ত ইহলোকের মায়া কাটাইতে পারে না। অশীতিবর্ষীয় পরম ঈশ্বরভক্তও ত মরিতে ভয় করে এবং মরিবার সময় এই সংসারের জন্য কাঁদে। কেহ কেহ মরিতে ভয় করে না সত্য; কেহ কেহ মরিবার সময় ইহলোকের নিমিত্ত কাঁদে না

সত্য; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এবং অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ বা ইহলোকে থাকিয়াও ইহলোক-বাসী নয়—সংসারশূন্য বৈরাগী; কেহ বা বার্দ্ধক্য বশতঃ আশা, স্পৃহা, অনুরাগাদি অনুভব করিতে অক্ষম; এবং কদাচিৎ কেহ বা গোঁড়ামির সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী। বস্তুতঃ, মানুষ পরলোকপ্রয়াসী হইয়াও ইহলোকের মোহে মুগ্ধ এবং ইহলোক ত্যাগ করিতে নিতান্তই ভীত এবং অনিচ্ছুক। এবং সেই জন্যই যিনি এখানে সম্পূর্ণরূপে পরলোকপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সংসারে থাকিয়া পরলোক চিন্তায় সংসারের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্ করিলে মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এবং সেই জন্যই পরলোক-প্রয়াসীর মনে ইহলোক এবং পরলোক লইয়া একটি বিষম গণ্ডগোল বাঁধিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মে গণ্ডগোল নাই; গণ্ডগোলের স্থানও নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আগাগোড়া সুমধুর সমতান—আগাগোড়া কোকিলের কুউ-ধ্বনি—আগাগোড়া মহাকাব্য। নিশ্চয় জানিও যাহার মনে ইহকাল এবং পরকাল লইয়া গোল আছে, যে পরলোকের নিমিত্ত ইহলোককে তুচ্ছ করিয়াও ইহলোকের জন্য কাঁদে, যে পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্ এবং উচ্চ করিয়াও ইহলোক ত্যাগ করিতে ভয় পায় (মুখে মানুক আর নাই মানুক কিন্তু মনে মনে সত্য সত্যই ভয় পায়) এবং ইহলোকের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে মরে, সে পরলোকও বুঝে নাই ইহলোকও বুঝে নাই; প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে সে তাহা জানে না। যে ধর্ম্মে পরলোক ইহলোক হইতে ভিন্ন, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়।

তুমি বলিবে, যে ব্যক্তি পরলোকপ্রয়াসী হইয়াও ইহলোকের জন্য কাঁদে, সে হীনবুদ্ধি, দুর্ব্বলমনা, প্রকৃত পরলোক কাহাকে বলে তাহা বুঝে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহলোকের জন্য কান্না এত দূষনীয় কেন? মরিতে ভয় করা এত লজ্জার কথা কেন? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি এবং যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদিগের নিমিত্ত কাঁদিব না কেন? ভালবাসাই জীবন—ভালবাসাই জীবনের প্রধান কার্য্য এবং

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। মানুষ ভালবাসিতে পারে বলিয়াই মানুষ পশু নয়—প্রকৃত মানুষ। মানুষ ভালবাসার বলে পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে পারে বলিয়াই মানুষ দেবতা। ভালবাসা পৃথিবীর জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার পরমাত্মা, ধর্ম্মের পবিত্র ভিত্তি, জগতের মোহিনী মূর্ত্তি। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমাকে যে ভালবাসে, তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব—তাহাকে ছাড়িয়া কেন যাইব? জগতের আবির্ভাব কাল হইতে মানুষ অশ্রুপূর্ণলোচনে করুণস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে! জগতে মানুষের আবির্ভাব কাল হইতে ধর্ম্মযাজকেরা বলিয়া আসিতেছেন—কাঁদিও না, যেথানে যাইতেছ সে বড় উচ্চ স্থান। কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই, মানুষ বরাবর স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। যাহাকে ভালবাসি, যে আমাকে ভালবাসে, তাহার নিমিত্ত কাঁদিয়া মরিতে তবে দোষ কি? কেনই বা না কাঁদিয়া মরিব? ধর্ম্মযাজকেরা যাহাই বলুন, এ কথার উত্তর নাই। ধর্ম্মযাজক বলেন—পরলোকে ঈশ্বরকে ভালবাসিও। কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই। তাহাতে মানুষের দোষ কি? কেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয় ধর্ম্মযাজক তাহা জানেন না এবং তাই মানুষকে বলিয়া দিতেও পারেন নাই। তাই মানুষ চিরকাল এইরূপ ভাবিয়া আসিয়াছেন ‘ঈশ্বরকে ভালবাসিব আমার এমন ক্ষমতা কই? যাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না তাঁহাকে কেমন করিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে পূরিব? আর তাঁহাকে কি জন্যই বা ভাল বাসিব? তাঁহার ত কোন অভাবই নাই যাহা আমি পূরণ করিব? কোন ক্লেশই নাই যাহা আমি মোচন করিব? কোন যন্ত্রণাই যাহা নাই আমি ঘুচাইব? যদি তাঁহার নিমিত্ত কিছু করিতেই পারিলাম না, তবে তাঁহাকে কেমন করিয়া ভালবাসিব? কিছু করিতে না পারিলে ত ভালবাসা হয় না* ? তাই মানুষ ধর্ম্মযাজকের কথায় কাণ দিয়াও কাণ দেয় নাই, সৃষ্টি

---

* "For love, I think, chiefly grows in giving; at least its essence is the desire of doing good, or giving happiness."
Ruskin's *Modern Painters*, Vo II. P. 88.

কর্ত্তাকে ছাড়িয়া সৃষ্টবস্তুর জন্য লালায়িত। সেই জন্যই প্রায় সকল দেশে সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এই বলিয়া মনকে বুঝাইয়া আসিতেছেন যে, ইহলোকে যে ভালবাসার পদার্থটীকে হারাইয়াছি, তাহাকে পরলোকে পাইব, যে ভালবাসার পদার্থটীকে রাখিয়া যাইতেছি, সে পরলোকে আমাদের কাছে যাইবে। খ্রীষ্টীয় জননী কোলের মাণিক হারাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া থাকেন—"যাদু,এখন তঁাহার কাছে থাক, আমি গিয়া আবার তোমাকে বুকে করিয়া লইব!" এক মহাপুরুষের মাতৃদেবীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাঁহার পিতৃঠাকুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিবস তাঁহার পিতৃঠাকুর বলিয়াছিলেন—"আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাও—সে, এতদিনের পর আমাকে লইতে আসিয়াছে—আমি তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি।" * ভগবান মনু বলিয়াছেন, যে যে পতিপ্রাণা বিধবা একমনে পতিধ্যানে জীবন যাপন করিয়া থাকেন, তিনি পরলোকে পতিক্রোড় পুনর্লাভ করেন। এইরূপে মানুষ তাহার প্রকৃতির সফলতা সাধন করে; ধর্ম্মযাজকের উপদেশ এবং মনের সুগভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে বিষম বিসম্বাদ আছে, তাহার কথঞ্চিৎ উপশম সম্পাদন করে। কিন্তু এত করিয়াও মানুষের সুখ নাই। মনে এত আশা ফলাইয়াও মানুষ মরিতে ভয় করে। লোকে বলে মানুষ দুর্ব্বল তাই মরিতে ভয় করে। তা নয়। মরিতে ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্ম্মযাজকেরা মানুষকে মৃত্যুভয় শিখাইয়াছেন। তাঁহারা যে নরক যন্ত্রণার কথা বলেন তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের কঠোর দণ্ডনীতিই তাহাদিগের বিনাশ সম্পাদন করিবে। আধুনিক উন্নত চিন্তার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, দণ্ডের দ্বারা চরিত্রের প্রকৃত সংশোধন হয় না। এবং সেই জন্যই আজিকাল শিক্ষাকার্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে দণ্ডবিধি উঠিয়া যাইতেছে। প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে দণ্ডবিধি উঠিয়া না গেলে প্রচলিত ধর্ম্মও উঠিয়া যাইবে। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক। মৃত্যুভয়ের আসল কারণ এই। যে হৃদয়ের নিধিটিকে হারাইয়াছি তাহাকে আবার পাব, যে হৃদয়ের নিধিটিকে রাখিয়া যাইতেছি তাহাকেও আবার পাব,—মনে এই আশা

---

* পারিবারিক প্রবন্ধ, ১০২ পৃষ্ঠা।

বড়ই প্রবল। ধর্ম্মের শিক্ষা, ধর্ম্মযাজকের উপদেশ ঠেলিয়া ফেলিয়া, পরলোকে ইহলোকের প্রেমপূর্ণ পরিবারটি দেখিতে পাইব,—মানুষের হৃদয়ের এই বাসনা যে কতই প্রগাঢ় তাহা আর কি বলিব। কিন্তু তবুও ত মন আশ্বস্ত হয় না। কই কেহই ত নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলে না যে আমার আশা পূর্ণ হইবে, যে প্রেমময় পরিবারে এখানে আছি, সেখানেও সেই প্রেমময় পরিবারে থাকিতে পাইব? সেই জন্যই ত এত আশা সত্বেও মরিতে এত ভয় করে। কে বলে যে সে ভয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ? যে বলে সে জানে না যে ভয় পবিত্র প্রেমের প্রাণ।

কিন্তু এত আশা করিয়াও মানুষের মনে যে এত ভয়, ইহার কি কোন কারণ আছে? আছে বৈ কি। সে কারণের নাম—অদৃষ্ট। আমি কেমন করিয়া জানিব যে পরলোকে আমি আমার ভালবাসার জিনিস গুলি পাইব? ইহলোকেই ত আমার সকল আশা পূর্ণ হয় না। আমি একটি বিশিষ্ট কারণে আমার স্ত্রীপুত্রকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে গেলাম। সেখানে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখিয়া সুখ হইল না। কেননা যাহাদিগের সুখের নামই সুখ, যাহাদিগকে সুখের ভাগ দিতে না পারিলে সুখ দুঃখে পরিণত হয়, তাহারা আমার কাছে নাই। নাই কেন? না আমি আমার ইহয়াও সম্পূর্ণরূপে আমার নই এবং তাহাদের হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নই। এই ক্ষুদ্র সংসারে আমি এবং তাহারা যে কত শক্তির এবং কত রকম শক্তির ক্রীড়ার পদার্থ, কে তাহার ঠিকানা করিবে? আমি তাহাদিগকে দেখিব মনে করিলেই দেখিতে পাই না, তাহাদিগকে কাছে আনিব মনে করিলেই কাছে আনিতে পারি না। তাহারা যেমন আমাকে একদিকে টানিতেছে, তেমনি শত সহস্র শক্তি আমাকে শত সহস্র দিকে টানিতেছে। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রের মধ্যেই যদি এইরূপ হইল; তবে কেমন করিয়া বলিব যে দেহান্তে যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমার চক্র হইয়া উঠিবে, *তখন আমি আমার ভালবাসার জিনিস গুলিকে আমার কাছে রাখিতে পারিব? ব্রহ্মা-

---

* পরলোক কোথায়?—নামক প্রবন্ধ দেখ।

ণ্ডের কোটি কোটি শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি কার্য্য, কোটি কোটি সংযোজনা, কোটি কোটি ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন করিতেছে। সেই ভীষণ শক্তি সংগ্রামে কে কখন্ কি হইয়া যাইতেছে, কে কখন কি হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি দেহত্যাগ করিলে সেই শক্তিরাশি আমাকে লইয়া কি করিবে কেমন করিয়া জানিব? আমার হৃদয়দেবী মরিলে সেই শক্তিরাশি তাঁহাকে লইয়া কি করিবে কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া জানিব? যখন এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রেই এত কাটাছেঁড়া, তখন বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের হাতে পড়িলে কি হইবে কেমন করিয়া বলিব? ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রয়োজন—আমার নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা কত উচ্চতর প্রয়োজন। কোন্ প্রয়োজনে আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে কেমন করিয়া জানিব?-সাধে কি মরিতে ভয় করি?

কিন্তু সে ভয় কি নিবারণ করা যায় না? বোধ হয় যায়। পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক মনে করিও না। ইহলোকে যাহা জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার পরমাত্মা, সেই ভালবাসাকে পরলোকেও জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার পরমাত্মা করিও। কিন্তু ইহলোকে যাহাকে ভালবাস, তাহাকে যে পরলোকে পাইবে, তাহার ত কোন ঠিকানা নাই। তবে কি করিবে? আমি বলি তোমার ভালবাসা বিশ্বব্যাপী হউক। বিশ্বব্যাপী ভালবাসা কাহাকে বলে, প্রচীন হিন্দুরা তাহা জানিতেন, আর কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। কোম্তের ভালবাসা অতি সঙ্কীর্ণ। আমার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোম্তের ভালবাসা মনুষ্যসম্বদ্ধ। কোম্তের ভালবাসায় আমার কুলায় না। কি জানি মরিয়া যদি এমন স্থানে যাইতে হয়, যেথানে মানুষ নাই, তাহা হইলে ত মরিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। তাই বলি প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বব্যাপী ভালবাসা শিক্ষা কর। সমস্ত বিশ্বমণ্ডলকে স্ত্রীপুত্রের ন্যায় ভালবাস, দেখিবে যে ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে এখন যে বিবাদ আছে তাহা মিটিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মোপদেশ এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা ভঙ্গ হইয়াছে, মানুষের পারলৌকিক চেষ্টা এবং আশার মধ্যে যে গণ্ডগোল আছেতাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহলোকেও ভাল-

ষাস, পরলোকেও ভালবাসিবে। বিশ্ব-শক্তি বিশ্বমণ্ডলের অন্তর্ভূত পদার্থ বিশেষকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে এবং করিতে পারে; কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-মণ্ডলের কিছুই করিতে পারে না। তুমি মরিয়া কোথায় যাইবে তাহার ঠিকানা নাই; তোমার স্ত্রী মরিয়া কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু তুমি মরিয়া যেখানেই যাও এবং তোমার স্ত্রী মরিয়া যেখানেই যান, তুমি যদি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থকে তোমার স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসিয়া মরিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে মরিতে ভয় করিতে হইবে না, মরিতে কাঁদিতে হইবে না। ইহলোকেও যেমন ভাল-বাসায় ভাসিয়াছ, পরলোকেও তেমনি ভালবাসায় ভাসিবে। সাধনা বড় কঠিন; কিন্তু ফলও বড় চমৎকার। বিশ্বব্যাপী ভালবাসাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে ভয় নাই, সন্দেহ নাই, ইহলোক এবং পরলোকের বিবাদ নাই, শিক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিরোধ নাই। সেই ধর্ম্মের নামই বিশ্ব-জীবন, বিশ্বকাব্য, বিশ্ব-গীত, বিশ্ব-মোহিনী। সমগ্র বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত বিশ্ব-দেবতা এবং বিশ্বব্যাপী ভালবাসা সেই বিশ্বদেবতার বিমোহন মূর্ত্তি।

আনুসঙ্গিক কথা।

(ভালবাসা।)

ধর্ম্মচর্য্যার সহিত ভালবাসার কি গূঢ় সম্বন্ধ তাহা জানা গেল। ভাল-বাসা সম্বন্ধে মানবজাতির শিক্ষা কতদূর হইয়াছে এবং কত বাকী আছে এখন তাহা দেখা আবশ্যক। ভালবাসা ভিন্ন সংসার চলে না। ভালবাসা ব্যতীত জীবন থাকে না। ভালবাসার গুণে দয়া মমতা আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা—যাহাতে জীব বাঁচে বাড়ে সুখী হয়—সবই। কিন্তু এমন যে ভালবাসা, পৃথিবীতে ইহা বড়ই বিরল—ইহার পরিমাণ নিতান্তই কম। মনুষ্য মধ্যে ভালবাসা শব্দের ছড়াছড়ি, সকলেই সকলকে বলে—ভালবাস, ভালবাস—মানুষের মুখে কেবলই ভালবাসার ভাণ। আবার আগেকার অপেক্ষা এখন কি ইউরোপ কি এসিয়া, কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ, সর্ব্বত্রই ভালবাসা শব্দের বড়ই রোল উঠিয়াছে—যেন পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, ছেলে

বুড়া, মেয়ে পুরুষ, সকলেই সকলকে কেবল ভালবাসিয়াই বেড়াইতেছে। এখন ধান ভানিতেও ভালবাসার কথা, কাঠ কাটিতেও ভালবাসার কথা, ভাত রাঁধিতেও ভালবাসার কথা, বই লিখিতেও ভালবাসার কথা, সমাজ ভাঙ্গিতেও ভালবাসার কথা, সমাজ গড়িতেও ভালবাসার কথা, সকল কথাতেই সকলে কেবল সকলকে বলিতেছে—ভালবাস, ভালবাস, ভালবাস। আজিকালিকার বাঙ্গালা সাহিত্য ভালবাসার হুঙ্কারে পরিপূর্ণ। এমন বই, এমন পত্রিকা, এমন প্রবন্ধই নাই যাহাতে ভালবাসার হুঙ্কারে পাঠকের কাণে তালা লাগে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজিকার মনুষ্যসমাজে এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালবাসা বড়ই বিরল—কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না—লোকের মধ্যে কেবল হিংসা ও দ্বেষ—কেবল মুখে ভালবাসা শব্দের গগনভেদী রোল। কপটতার এত প্রাদুর্ভাব পৃথিবীতে আর কখন হয় নাই। মনুষ্যসমাজের এমন দুরবস্থা আর কখন দেখা যায় নাই। মানবাত্মা এমন ব্যবসাদারি-ভক্ত আর কখন হয় নাই। মানুষ আজ বড় অসুখী, তাই সুখ-দুঃখ-তত্ত্ব লইয়া এত ব্যস্ত। আজিকার মানব-সাহিত্যের ভীষণ বিস্তার বড় একটা সুখের কথা নয়, কেন না তাহা প্রধানত কেবল মানুষের অধোগতির এবং দুঃখ বৃদ্ধির ফল ও প্রমাণ!

আজকাল সর্ব্বত্র লোকের মুখে ভালবাসা শব্দ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোক আসলে ককে যে খুব কমই ভালবাসে তাহার একটি প্রমাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে এবং তাহার দেখাদেখি এখনকার বঙ্গীয় সাহিত্যে ভালবাসার প্রকৃতি যেরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় যে, পৃথিবীতে আজ ভালবাসা শব্দের রোল যতই বেশী হউক, প্রকৃত ভালবাসা কিছুমাত্র নাই। এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন যে, ভালবাসা একটি দুর্ব্বোধ্য রহস্য বা mystery, উহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিতে পারা যায় না। আধুনিক ইংরাজ কবিদিগের মুখে এবং ইংরাজি কবিতা-প্রিয় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মুখে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বোধ্য রহস্য হউক আর নাই হউক, উহাকে দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়া বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফল এই হয় যে, ভাল না বাসা বা ভালবাসিতে না পারা দূষণীয় বলিয়া লোকের কাছে গণ্য হয়

না। যাহার এইরূপ বিশ্বাস যে ভালবাসা দুর্ব্বোধ্য রহস্য বা mystery, অর্থাৎ ভালবাসা কি কারণে উৎপন্ন হয় বলিতে পারা যায় না, তাহার মনের কথা এই যে ভালবাসা না বাসা মানুষের কর্ত্তৃত্বাধীন নয়, অতএব আমি যদি কাহাকে ভাল না বাসি তবে আমার কোন দোষ দায়িত্ব বা অপরাধ নাই। এখন বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে প্রয়াস পাইতে হইবে না যে, যেখানে লোকের ভালবাসা সম্বন্ধে এই রূপ বিশ্বাস বা সংস্কার সেখানে ভালবাসার রাজ্য বড় একটা বিস্তার লাভ করে না, বরং ঐ বিশ্বাসের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিয়াই যায়। কি ইউরোপে কি ভারতবর্ষে আজ তাহাই ঘটিতেছে! সর্ব্বত্রই ভালবাসার ধূয়া যত চড়িতেছে, প্রকৃত ভালবাসা তত কমিতেছে!

এই শ্রেণীর লোক ইহাও বলিয়া থাকেন যে ভালবাসা যেমন একটি দুর্ব্বোধ্য রহস্য বা mystery, উহার উৎপত্তি ও তেমনি আকস্মিক এবং দুর্দ্দমনীয়। প্রমাণ স্বরূপ আন্তনি এবং ক্লিওপাতারার ভালবাসার কথার, রোমিও এবং জুলিয়েতের ভালবাসার কথার, বৎসরাজ এবং রত্নাবলীর ভালবাসার কথার উল্লেখ করা হয়। এবং এ শ্রেণীর বঙ্গীয় লেখকগণ ইংরাজি কোর্টশিপে যে দুর্দ্ধর্ষ আকর্ষণাগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহারও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু নিবিষ্ট মনে এই সকল এবং এই প্রকার প্রমাণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এরূপ স্থলে যে ভালবাসা হয় তাহা এত আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় হইবার কারণ এই যে, তাহার প্রধান অংশ ঐন্দ্রিয়িক লালসা এবং রূপজ মোহ, ঠিক মনের ভালবাসা নয়। সৌন্দর্য্য বা beauty দেখিলে তৎপ্রতি যে অনুরাগ জন্মে তাহা আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় বটে, কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়, রূপজ মোহ মাত্র। জিহ্বা দ্বারা তিক্ত মিষ্ট প্রভৃতি রসাস্বাদ যেমন আকস্মিক এবং অনিবার্য্য, আকৃতিগত সৌন্দর্য্য (physical beauty) দেখিলে তৎপ্রতি অনুরাগ ও ঠিক তেমনি আকস্মিক (instantaneous) এবং অনিবার্য্য। রসাস্বাদও যেমন ভালবাসা নয়, আকৃতিগত সৌন্দর্য্য দর্শনে তৎপ্রতি যে অনুরাগ জন্মে তাহা ও তেমনি ভালবাসা নয়। এবং উল্লিখিত উদাহরণ স্থলে যে ভালবাসা দেখা যায় তাহাতে ঐন্দ্রিয়িক লালসা থাকে বলিয়া তাহা এত দুর্দ্দম-

নীয়। কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক লালসা ভালবাসা নয়, কটু মিষ্ট রসাস্বাদের ন্যায় শারীরিক বিকার বা কার্য্য মাত্র। অতএব যাঁহারা ভালবাসাকে আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রকৃত ভালবাসার সহিত ঐন্দ্রিয়িক লালসা এবং রূপজ মোহের যে পার্থক্য আছে তাহা দেখিতে পান না এবং বুঝিতে পারেন না বলিয়া এই ভ্রম করিয়া থাকেন। এবং এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই আজকাল অনেক বঙ্গীয় লেখক এবং সমাজ সংস্কারক বলিয়া থাকেন যে যে বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় ভালবাসা আকস্মিক আপনা আপনি এবং দুর্দ্দমনীয় ভাবে উৎপন্ন হয় না, সে বিবাহ বিবাহই নয়, কেন না সে বিবাহে ভালবাসা জন্মিতে পারে না। তাই তাঁহারা হিন্দু বিবাহ প্রণালীর এত নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখনকার কথা এই যে ভালবাসা আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় জিনিস হউক বা না হউক, যাঁহারা ভালবাসাকে সেই ভাবে বুঝিয়া থাকেন তাঁহাদের মতের অর্থ এই যে ভাল বাসা না বাসা মনুষ্যের কর্তৃত্বাধীন নয় এবং যদি কেহ কাহাকে ভাল না বাসে তবে তাহার কোন দোষ দায়িত্ব বা অপরাধ নাই। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে যেখানে লোক ভালবাসাকে আকস্মিক স্বতঃ উৎপন্ন এবং দুর্দ্দমনীয় জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করে সেখানে ভালবাসার রাজ্য বড় একটা বিস্তার লাভ করে না, বরং ঐ বিশ্বাসের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিয়াই যায়। আজ পৃথিবীময় তাহাই ঘটিতেছে! কি ভারতবর্ষে কি ইংলণ্ডে ভালবাসার ধূয়া বাড়িতেছে, কিন্তু ভালবাসা কমিতেছে!

যে শ্রেণীর লোকের কথা বলিলাম তাঁহাদের অপেক্ষা এক অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের ভালবাসা সম্বন্ধীয় মত অনেক উৎকৃষ্ট। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ভালবাসা যে একটা বিশেষ দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery তা নয়। জগতের সকল জিনিসে যেমন একটু করিয়া দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery থাকে ইহাতেও তাই আছে, তদপেক্ষা বেশী কিছুই নাই। রাগে, দ্বেষে, দয়ায়, ফুলফোটায়, চেতন বা অচেতন পদার্থের গতিতে যেমন একটু রহস্য বা mystery আছে, ভালবাসাতেও তাই

আছে। আর ভালবাসা কেন বা কেমন করিয়া হয়, তাহা যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না তাও নয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ভালবাসা প্রধানত দুই কারণে জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বাভাবিক সম্বন্ধের বলে, যেমন পিতাপুত্রের মধ্যে; দ্বিতীয়তঃ গুণদর্শনে, যেমন বন্ধুর মধ্যে। স্বাভাবিক সম্বন্ধ মূলক ভালবাসা যে শুধু ভালবাসা, আর কিছুই নয়, তা বোধ হয় না। কেন না স্বাভাবিক সম্বন্ধ শোণিত মূলক; অতএব সম্বন্ধ মূলক ভালবাসায় একটি জড় অংশ আছে যাহা পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জীবেও বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও মনুষ্যের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ মূলক ভালবাসায় মনেরও প্রভূত সম্পর্ক আছে। সেই মানসিক অংশ গুণদর্শনে বা গুণানুভবে বৃদ্ধি হয়, যথা পুত্র যত গুণবান হয় পিতার ভালবাসা তত বাড়িতে থাকে। সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অভাবে যে ভালবাসা হয়, অর্থাৎ, বন্ধু প্রভৃতির মধ্যে যে ভালবাসা হয়, তাহা গুণ দর্শন বা গুণানুভব মূলক বলিয়া গুণ বৃদ্ধি বা অধিকতর গুণানুভব সহকারে বাড়িয়া থাকে। অতএব এ ভালবাসা যে শুধু ক্রমশ জন্মে তা নয়, ইহা পরিবর্দ্ধনশীল। ভালবাসার পাত্রের গুণ যত দেখিতে পাওয়া যায় বা বাড়িতে থাকে এ ভালবাসা তত বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গুণ দর্শন নিজের মানসিক শক্তি অনুশীলন সাপেক্ষ, এবং গুণবৃদ্ধি ভালবাসার পাত্রের মানসিক শক্তি অনুশীলন সাপেক্ষ। অতএব এ ভালবাসার বৃদ্ধি অনেক পরিমাণে পর সাপেক্ষ এবং সেই জন্য বহুল মাত্রায় অনিশ্চিত। অনেক লোক সর্ব্বদাই আত্মোন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া থাকে এবং অনেক লোক হয়ও না। সেই জন্য গুণদর্শন মূলক ভালবাসা অনেক স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার অনেক স্থলে হয়ও না। আবার গুণদর্শন মূলক ভালবাসা কতক পরিমাণে নিজের গুণদর্শনশক্তি সাপেক্ষ। কিন্তু যেখানে আত্মাদর বা আত্মাভিমান বেশী কিম্বা আত্মোন্নতি কম সেখানে সে শক্তিও কম হয়, সুতরাং পরের গুণ বেশী হইলেও ভালবাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অতএব গুণদর্শন মূলক ভালবাসা বর্দ্ধনশীল এবং সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের ভালবাসার অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইলেও সর্ব্বথা বর্দ্ধনশীল বা বিঘ্নহীন নয়। তাই কি ইংলণ্ডে কি ভারতে কোথাও পণ্ডিত এবং গুণবানের মধ্যে ভালবা-

সার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, হিংসা এবং আত্মশ্লাঘাই প্রবল—সর্ব্বত্রই ভালবাসার ধুয়া খুব চড়া, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা খুব কম।

তবে কোন্ প্রণালীতে ভালবাসিলে পৃথিবীতে ভালবাসা বৃদ্ধি হয়, জীবজগতে ভালবাসার ডোর দীর্ঘ এবং দৃঢ় হয়? আমাদের মতে একটি মাত্র প্রণালী আছে, সেই প্রণালীতে ভালবাসিলে সেই মহৎ এবং মোহন ফল লাভ করা যায়। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপনাকে এবং সমস্ত প্রাণীকে এবং সমস্ত জগৎকে সেই পরম প্রেমভাজন সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভাবিয়া সমস্ত মনুষ্যকে, সমস্ত প্রাণীকে, সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিলে তবে অবাধে ভালবাসার রাজ্য বিস্তৃত হইতে পারে। যাহাকে ভালবাসিব সে ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আসিয়া যায় কি? সে ভাল হইলেও তাহাকে ভালবাসিব, মন্দ হইলেও তাহাকে ভালবাসিব। কেননা যে ভাল সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ, যে মন্দ সেও সচ্চিদানন্দের বিকাশ। ভালবাসা আমার হৃদয় হইতে নির্গত হইবে, অপরের উপর গিয়া পড়িবে। ভালবাসা সম্বন্ধে আমার এবং অপরের মধ্যে এই মাত্র সম্পর্ক। আমার হৃদয় আমার ভালবাসার এক মাত্র উৎস হইবে, অপরের হৃদয়কে আমার ভালবাসার উৎস হইতে কেন দিব? আমার হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে কেন দিব? দিলেই বা আমার হৃদয়োদ্ভূত উৎস ভাল খেলিবে কেন? আর আমার হৃদয়োদ্ভূত উৎস ভাল না খেলিলে আমি কেমন করিয়া আমার জগৎকে প্রেমবারিতে প্লাবিত করিয়া সচ্চিদানন্দে পরিণত করিব? ভালবাসা যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের আয়ত্তাধীন হয়, ততক্ষণ ভালবাসার নিশ্চয়তা কোথায়, বিস্তারের স্থিরতা কৈ? তোমার গুণাগুণ দেখিয়া যদি আমার তোমাকে ভালবাসিতে হয়, তবে আমি যে তোমাকে ভালবাসিবই তাহার নিশ্চয়তা কৈ? তোমাতে যদি তেমন গুণ না দেখি তাহা হইলে ত আর আমার তোমাকে ভালবাসা হইল না। আর যদি তোমাকে ভাল নাই বাসিলাম তবে আমারই বা তোমার কাছে থাকা কেন? তোমারই বা আমার কাছে থাকা কেন? তাই বলি, আপনাকে বা আপনার হৃদয়কে ভালবাসার এক মাত্র ভিত্তি করিতে হইবে, তবেই সমস্ত জগৎ আপনার ভিতর আসিবে, আপনার উপর দাঁড়াইবে,

নচেৎ নয়। নচেৎ আমার জগতের খানিকটা আমার বাহিরে গিয়া পড়িবে, আমার সহিত মিশিবে না। কিন্তু আমার জগতের খানিকটা যদি আমার সহিত না মিশে তাহা হইলে আমার জগৎ এবং অস্তিত্ব দুইই অসম্পূর্ণ হইবে এবং আমার জগদীশ্বরের সহিত আমার মেশা হইবে না, আমি ঈশ্বরভ্রষ্ট পামর হইব। অতএব জগৎ ভাল কি মন্দ সে বিচার করিয়া জগৎকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিও না, কেন না তাহা হইলে জগৎকে ভালবাসিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সমস্ত জগৎ সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব সমস্ত জগৎ ভালবাসার পাত্র, বাল্যকাল হইতে মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিও, হৃদয় এই ভাবে ভরাইয়া তুলিও, তাহা হইলে ভালবাসায় বাধা বিঘ্ন দেখিবে না, যা দেখিবে তাই ভাল বাসিবে, ব্রহ্মাণ্ড ভালবাসায় ভরিয়া উঠিবে, ভালবাসার রাজ্য আর বিশ্বনাথের রাজ্য সমঃসীমা সম্পন্ন হইবে। তাহা হইলে ভালবাসার পাত্র বা মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। আধুনিক ইংরাজ কবিরা তাহাই করিয়া থাকেন। সমস্ত জীবিত নরনারীর মধ্যে মনের মানুষ খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহারা কাল্পনিক মনের-মানুষ সৃষ্টি করেন। এবং তাঁহাদের দেখা দেখি বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবি দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাই করিতেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়। বিশ্বনাথকে যে বিশ্বময় বলিয়া জানে তাহাকে কি আবার মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, না কল্পনায় সৃষ্টি করিতে হয়? যাহার বিশ্বনাথ নাই, যাহার সচ্চিদানন্দ নাই, যাহার প্রকৃত ধর্ম্মভাব নাই, যে কেবল আত্ম-সর্ব্বস্ব, কেবল সেই ভালবাসার পাত্র, মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়, কেবল সেই বিধাতার জগতে জীবন্ত মনুষ্যের মধ্যে মনের মানুষ না পাইয়া কল্পনার জগতে মনের মানুষ সৃষ্টি করে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ যীশু খৃষ্টের অপূর্ব্ব প্রেম-সম্বাদ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই আজ মনের মানুষ খুঁজিয় আপনার সাহিত্য এবং সমাজকে কুপথগামী করিতেছে। এবং ইউরোপের দেখা দেখি আমাদের স্বদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকে আমাদের সাহিত্য এবং সমজেকে কুপথগামী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের কবিরাও আজ বিধাতার সৃজিত অসংখ্য নরনারীর মধ্যে ভালবাসার পাত্র না পাইয়া কল্পনায় ভালবাসার পাত্র সৃষ্টি করিতেছেন এবং আমা-

দের নব্য সমাজ-সংস্কারকেরাও মনের মানুষ খুঁজিয়া বিবাহ না করিলে বিবাহে ভালবাসা হয় না এই মতের পক্ষপাতী হইয়া আমাদের প্রাচীন বিবাহ প্রণালীর উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ান, ভালবাসার পাত্র বাছিয়া বেড়ান অধার্ম্মিক এবং অশিক্ষিতের কাজ, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কাজ নয়। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কাছে সকলই ভালবাসিবার জিনিস। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সকলকেই মনের মানুষ করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিয়া ভালবাসিতে পারেন। যে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্মাভিমান বিনাশ করিয়া আপনাকে ভগবদ্ভাবে ভরাইয়া ফেলিয়াছে, সে সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে সক্ষম হইয়াছে—তাহার ভালবাসার হেতু কেবল সে আপনি, আর কেহ বা আর কিছুই নয়। ভালবাসার রাজ্য অবাধে বিস্তৃত করিতে হইলে সকলকে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্মাভিমান বিনাশ করিয়া আপনাদিগকে ভগবদ্ভাবে ভরাইয়া ফেলিতে হইবে, তবেই সকলে কেবল আপনা আপনি ভালবাসার হেতু হইতে পারিবেন। ভগবানের প্রকৃত সেবার নিমিত্ত, ভগবানের ভবের প্রকৃত উন্নতির নিমিত্ত মানুষের এ শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ শিক্ষা অন্যত্র কঠিন হইতে পারে কিন্তু ভারতে কঠিন নয়। ভারতের ঈশ্বর জগন্ময়—খৃষ্টানের ঈশ্বরের ন্যায় জগৎ হইতে পৃথক নন। অতএব বহুকালের সংস্কারের গুণে ভারতবাসী সহজেই জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসিতে পারিবে। আবার ভারতে দৃষ্টান্তও ভারতবাসীর অনুকূল। আর কেহ কোথাও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসেন নাই, কিন্তু ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষেরা সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালবাসিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের বংশধর, কেন না তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে পারিব? দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে জগদীশ্বরের প্রকৃত পূজার জন্য এবং জগদীশ্বরের জগতের প্রকৃত উন্নতির জন্য মানুষের যে নূতন এবং পরিশুদ্ধ ভালবাসার পদ্ধতি আবশ্যক হইয়াছে, ভারতবাসী কর্তৃক পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমেই তাহার প্রথম অনুষ্ঠান হইবে।

পরলোক কোথায় ?

পরলোক কোথায় কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিয়া আসিয়া বলে নাই, কেহ কোন পরলোকবাসীর মুখে শুনিয়া মানুষকে জানায় নাই। যে পরলোক পরলোক করিয়া মানুষ চিরকাল উন্মত্ত, চিরকাল ইহলোক-বিস্মৃত, সে পরলোক মানুষ কখন দেখিতে পাইল না অথবা কোন পরলোক-বাসীর মুখে তাহার কোন সম্বাদ শুনিল না ! যেমন চিন্তাশীল চিন্তাকুল হ্যামলেটের পক্ষে, তেমনি সমস্ত মানবজাতির পক্ষে পরলোক চিরকালই একটী—

"Undiscover'd country, from whose bourne
No traveller returns."

ইহা কি মানুষের দুরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট ? এ কথার মীমাংসা পরে হইবে। কিন্তু দুরদৃষ্টই হউক আর শুভাদৃষ্টই হউক পরলোক কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই—বোধ হয় হইবেও না।

কিন্তু না দেখিয়াও মানুষ চিরকাল পরলোক দেখিয়া আসিতেছে—পরলোকের ছবি মানুষের সাম্‌নে চিরকাল উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। নিতান্ত অসভ্য অবস্থার কথা বলিব না। ইংরাজি গ্রন্থে অসভ্যের পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা গুলি যে ঠিক, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত ঠিক বলিয়া বোধ হয় যে, অসভ্যের মধ্যে অনেকের পরলোক জ্ঞান নাই, অনেকের আছে। যাহাদের পরলোক জ্ঞান আছে তাহাদের পরলোক স্বর্গ ও নরকের ন্যায় দুইটি নির্দ্দিষ্ট স্থান, কিন্তু ইহলোকের পাপপুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত সে স্থান সৃষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।* অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষ বহুকাল এইরূপ বুঝিতেছে যে, ইহলোকের পর একটি নির্দ্দিষ্ট পরলোক আছে। ইহলোকের পাপপুণ্যের ফল স্বরূপ সেই পরলোকে বাস করিতে হয়। প্রাচীন মিসরবাসীরা এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীর নিম্নে একটি ভয়া-

*Sir John Lubbock সাহেবের Origin of Civilisation নামক গ্রন্থের ৩০৪ এবং ৩০৫ পৃষ্ঠা।

নক অন্ধকারময় বিভীষিকাপূর্ণ স্থান আছে; মানুষ মরিয়া প্রথমে সেই খানে যায়, এবং পাপপুণ্যের বিচারে দণ্ডিত হইলে সেইখানেই বিষম যন্ত্রণা-ভোগ করে, এবং মুক্তিলাভ করিলে কোন একটি আলোকময় পুরীতে গমন করে। প্রাচীন পেরুনিবাসীরা এইরূপ বুঝিত যে, পাপীলোক পৃথিবীর গর্ভ-স্থিত একটি যন্ত্রণাপূর্ণ স্থানে যন্ত্রণাভোগ করে এবং পুণ্যাত্মারা একটি অতি রমণীয় স্থানে বিপুল বিলাসের অধিকারী হইয়া অপূর্ব্ব সুখে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করে। মহাকবি হোমরের নরকের চিত্র সকলেই দেখিয়াছেন। সে চিত্রে নরক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং সে স্থান একটি নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিবিশিষ্ট। সেখানে পাপপুণ্যের বিচার হয়। মুসলমানেরও নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ এবং নরক আছে। সে স্বর্গ পৃথিবীর উপরে, সে নরক পৃথিবীর নীচে। সে স্বর্গে পুণ্যাত্মা পরম সুখে মাতিয়া থাকে, সে নরকে পাপাত্মা ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। মুসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানেরও নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ ও নরক আছে। সে স্বর্গও পৃথিবীর উপরে, সে নরকও পৃথিবীর নীচে। সে স্বর্গে খ্রীষ্টপ্রসাদানুগৃহীতেরা পরম সুখে—পরম উল্লাসে ঈশ্বরের স্তুতি গান করিয়া থাকে, সে নরকে যাহারা খ্রীষ্টপ্রসাদে বঞ্চিত, তাহারা অসীম অপার অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। সে স্বর্গ এবং সে নরকের ছবি দাঁতে এবং মিল্টন উভয়েই আঁকিয়াছেন। খ্রীষ্টান এবং মুস-লমানের ন্যায় সাধারণ হিন্দুরও পৃথিবীর উপরে নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ এবং পৃথিবীর নীচে নির্দ্দিষ্ট নরক আছে। সে বৈকুণ্ঠ এবং সে নরকও পাপপুণ্যের ফল। কিন্তু সে বৈকুণ্ঠ এবং নরক ছাড়া, সাধারণ হিন্দুর আরো একটি পরলোক আছে। সে পরলোক এই পৃথিবী। এক জন্মের কর্ম্ম গুণে এই পৃথিবীতেই অপর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে বহুজন্ম পরিগ্রহের পর, হয় উপরে বৈকুণ্ঠে, নয় নীচে নরকে গমন করিতে হয়। কর্ম্মগুণে জন্মান্তরের কথা বৌদ্ধেরাও মানিয়া থাকে, সুতরাং এই পৃথিবীই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পরলোক। হিন্দুর এই কর্ম্মফলমূলক পরলোক-বাদে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনমূলক পরলোকবাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক আধুনিক জর্ম্মাণ দার্শনিক বলিয়া থাকেন যে, ইহজন্মে আত্মার যে প্রকার শিক্ষা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে প্রকার উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা এই পৃথিবীতেই ঊর্দ্ধ-

গতি বা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। এ বীজ হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির পরলোকবাদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বীজ দুইটি পদার্থে নির্ম্মিত। প্রথমটি এই যে, পরলোক ঠিক পাপপুণ্যের ফল নয়, মানসিক প্রকৃতির ফল। দ্বিতীয়টী এই যে, পরলোক অপরের অনুমতি, অনুগ্রহ বা ব্যবস্থার ফল নয়, নিজের কর্ম্মের ফল, সুতরাং নিজের চেষ্টাধীন। আধুনিক উন্নত জর্ম্মাণি এই বীজটি অমূল্য বলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে ইহাকে অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরলোকবাদের প্রকৃত তথ্য এই বীজেতেই আছে। আজ জর্ম্মণি যেমন এই পরম তথ্যবিশিষ্ট বীজটি অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কাল হউক, পরশ্ব হউক, পৃথিবীর অপর সমস্ত সভ্য এবং শিক্ষিত জাতিকে তেমনি চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য থাকিলেও একটি তথ্য এ বীজে নাই। সে তথ্যটি কেবল মাত্র জ্ঞানী এবং প্রকৃতশাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর পরলোকবাদে আছে। দেখিলাম যে, এ পর্য্যন্ত মানুষ পরলোক অর্থে এক বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝিয়াছে। সাধারণ হিন্দুও তাহাই বুঝিয়াছে। সাধারণ হিন্দুর পরলোক ও নির্দ্দিষ্ট পরলোক,—হয় পৃথিবী, নয় নরক. নয় বৈকুণ্ঠ। কিন্তু আমি এই নির্দ্দিষ্ট পরলোকের অর্থ বুঝিতে পারি না। মানুষ মরিয়া কেন যে পৃথিবীতেই থাকিবে, অথবা নরকেই থাকিবে, অথবা বৈকুণ্ঠেই থাকিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের বিচার হইয়া একস্থানে একভাবে বিশ্রাম বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এ কথা আমাকে নিতান্ত অমূলক ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, একাবস্থায় অবস্থান জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি বস্তু মাত্রেরই নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম। জগতে চিরকারা-বাসী বা চিরপেনসনভোগীর স্থান নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, মানুষ মরিয়া হয় চিরকাল নরকে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে, নয় স্বর্গে থাকিয়া সুখভোগ করিবে? মিসরবাসী, পেরুনিবাসী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই এই কথা বলে। বলে বলুক। আমার পবিত্র পিতৃপুরুষ এ কথা বলেন না। খ্রীষ্টান মুসলমান অপেক্ষা তিনি বিশ্ব-রহস্য বেশী

বুঝিতেন। অতএব তিনি বলেন যে, মানুষের জন্মের পর জন্ম, তারপর আবার জন্ম, এইরূপ অসংখ্য জন্ম—অবস্থার পর অবস্থা, তার পর অপর অবস্থা, এইরূপ অসংখ্য অবস্থা। এই অসংখ্য জন্ম, এই অসংখ্য অবস্থা শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর মতে পৃথিবীসম্বদ্ধ নয়? শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর মতে মানুষ মরিয়া আপন কর্ম্মফলানুসারে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাই সঙ্গত, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। মানুষ পৃথিবীতে থাকে বলিয়া মরিলে কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রে বাস করিতে পারে না? মানুষের সহিত কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের সম্পর্ক নাই? আছে। কি বৈ হিন্দু ফলিতজ্যোতিষের স্থষ্টিকর্ত্তা। তাই তিনিই বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে থাকিয়া কোন মানুষ মঙ্গলের দ্বারা শাসিত, কোন মানুষ বৃহস্পতির দ্বারা শাসিত, কোন মানুষ শনির দ্বারা শাসিত। যদি পৃথিবীতে আমার ধাতু, আমার প্রকৃতি মঙ্গলের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া আমার মঙ্গলে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। যদি পৃথিবীতে তোমার ধাতু, তোমার প্রকৃতি বৃহস্পতির দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, তবে মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া তোমার বৃহস্পতিতে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। এখানে ত দেখিতে পাই, যে যাহার দ্বারা শাসিত হয়, তাহাকে লইয়া অথবা তাহার কাছে থাকাই তাহার প্রকৃতি। শস্য জলের দ্বারা শাসিত হয়। জলকে লইয়া না থাকিতে পাইলে শস্য থাকে না, মরিয়া যায়। এ নিয়ম কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে খাটে না? দূরতা হেতু কি এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে? দূরতা হেতু মাধ্যাকর্ষণিক নিয়মের ত কোন ব্যত্যয় ঘটে না। তবে কেন এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবে? তুমি বলিবে, আমি ফলিতজ্যোতিষ মানি না। আচ্ছা, নাই মান। আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র আছে, তা ত মান। তবে ঠিক করিয়া বল দেখি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ মানুষ হইয়াছে কি না? মানুষ মাথা তুলিয়া আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দেখিতে পায় বলিয়া পশু অপেক্ষা বড় হইয়াছে কি না, বল দেখি? অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া মানুষ দেবভাবে ভোর হয় কি না, বল দেখি? তবে কেমন করিয়া বল যে, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র

দ্বারা তুমি শাসিত নও? চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র তোমার মানসিক জগতের অপরিহার্য্য অংশ নয়? যদি তাহাই হয় তবে ত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মরিলে পর চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, নক্ষত্র বল, যেখানে বল, সেই খানে যাওয়াই সম্ভব। জগতে আকর্ষণই অস্তিত্বের কারণ। যদি আকর্ষণে আকর্ষিত না হও, তবে বাঁচিবে কি প্রকারে?

পৃথিবীর লোকের পুনঃজন্ম, পৃথিবীতে বই আর কোথাও হইতে পারে না, এ কথা কে বলিল? এ কথার কোন অর্থই দেখিতে পাই না। অনন্ত আকাশে যত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র আছে, পৃথিবী তাহাদের মধ্যে একটি। কিন্তু পৃথিবী কি অপর সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র? পৃথিবীর কি অপর গ্রহ নক্ষত্রের সহিত কোন সম্পর্ক নাই? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, সকল গুলিই পরস্পরের সহিত সুগভীর, সুদৃঢ়, সুমিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ। সকল গুলিই যেন পরস্পরের পরম আত্মীয়। সকল গুলিই যেন ভাই ভাই। সকল গুলির যেন এক প্রাণ, এক আত্মা, এক শিরা, এক ধমনী। সকল গুলি একত্রিত হইয়া যেন একটি অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি। সকল গুলি মিলিয়া যেন একটি মহামোহকর মন্ত্র। ভায়া কমলাকান্ত একবার আফিঙ্গের নেশায় ভোর হইয়া শুনিয়াছিলেন—"বৃহৎগ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে 'এসো এসো বঁধু এসো', সৌর পিণ্ড বৃহৎগ্রহকে ডাকিতেছে 'এসো এসো বঁধু এসো।' জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে 'এসো এসো বধু এসো।" অনন্ত আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণের মধ্যে যে মহাশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক তাহা মহাশূন্য নয়, গ্রহ নক্ষত্রও যেমন সেই মহাশূন্যও তেমনি দৃষ্টির অগোচর কল্পনার বহির্ভূত মহাশক্তির মহাপ্রাণের আবাসভূমি। সেই মহাপ্রাণ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া একটি মহাপিণ্ডবৎ করিয়া রাখিয়াছে। সেই মহাপিণ্ডের নাম বিশ্বমণ্ডল। তবে পৃথিবী নামে পৃথক্ গ্রহ কোথায়? বিশ্বমণ্ডলে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, তন্মধ্যে কোনটিকে পৃথক্ করিয়া ভাবা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, গ্রহ নক্ষত্র গুলি এক একটি সম্পূর্ণ পদার্থ। অতএব এক গ্রহ নক্ষত্রের পদার্থ অপর গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পারে না। ক্ষুদ্র

বৈজ্ঞানিক এ কথা স্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, তিনি জড়ত্বরূপ, শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু মহাদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক এ কথা মানেন না। তিনি ধ্যানবলে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া অসীম বিশ্বরাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া দেখিতে পান যে, প্রকৃত সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডল লইয়া—সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত Whole. যেমন প্রত্যেক পরমাণু সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট তেমনি প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রও সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট। কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের সম্পূর্ণতা একটা বিশালতর সম্পূর্ণতার অন্তর্গত ও অন্তর্ভূত। সেই বিশালতর সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের সম্পূর্ণতা। সেই বিশালতম সম্পূর্ণতার উপরে বা সম্মুখে দাড়াইলে পৃথক গ্রহ, পৃথক নক্ষত্র, পৃথক পৃথিবী—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বোধ হয় যেন, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত পৃথিবী সেই অসীম অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতায়, সেই প্রকৃত একে মিশিয়া রহিয়াছে।

তবে বলি যদি সম্পূর্ণতাই মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ কেমন করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? না,—সম্পূর্ণ হইতে হইলে মানুষকে সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের অসীম সম্পূর্ণতার সাহায্য লইতে হইবে। মানুষ মরিয়া যে আবার এই পৃথিবীতেই জন্ম গ্রহণ করিবে, এমন কোন কথা নাই। মানুষ মরিয়া কোন্ নক্ষত্রে, কোন্ সৌর জগতে যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। মিণ্টনের স্বর্গ বড়ই সুন্দর, বড়ই উচ্চ স্থান। কিন্তু বিশ্বমণ্ডলে মিণ্টনের স্বর্গ অপেক্ষা, দাঁতের স্বর্গ অপেক্ষা, মোহম্মদের স্বর্গ অপেক্ষা কত বেশী সুন্দর পবিত্র এবং উচ্চ স্থান আছে কে বলিতে পারে? মানুষ মরিয়া ক্রমান্বয়ে কত উন্নত এবং পবিত্র গ্রহ নক্ষত্রে উঠিতে থাকিবে, কল্পনাও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতার, পবিত্রতার, সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মযাজকের, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের এবং ধর্ম্মসংস্কারকের স্বর্গ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। ইউরোপে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গের জন্য ইহজন্মে এত কষ্ট করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু কল্পনাতীত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে এ কথা বলিবার যো নাই। তুমি যতই কেন উন্নতি এবং পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী হও না, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল তোমার আশা মিটাইতে পারিবে না, এ কথা তুমি মনেও আনিতে পারিবে না।

আবার ভাবিয়া দেখ, যিনি নির্দ্দিষ্ট স্বর্গের অভিলাষী তাঁহার ধর্ম্মচর্য্যাও নির্দ্দিষ্ট, তাঁহার চেষ্টার সীমা আছে। কিন্তু অসীম, অনির্দ্দিষ্ট, কল্পনাতীত বিশ্বমণ্ডল যাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য, তাহার ধর্ম্মচর্য্যার সীমা নাই; তাহার ধর্ম্মপথের শেষ নাই, তাহার উর্দ্ধগতি অনন্ত, তাহার নৈতিক চেষ্টা বিপুলতম অপেক্ষা বিপুল। যাহার পরলোক অনির্দ্দিষ্ট তাহার উন্নতির নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব ক্ষুদ্র স্বর্গের কথা ছাড়িয়া বিশাল বিশ্বমণ্ডলের কথা মনে কর। মরিয়া এমন গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পার, যেখানকার প্রেম পবিত্রতা এবং উন্নতি পৃথিবীর প্রেম পবিত্রতা এবং উন্নতি অপেক্ষা এত বেশী যে কল্পনায়ও তাহার ধারণা হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে কত প্রেমিক কত পবিত্র এবং কত উন্নত হইলে তবে সেই কল্পনাতীত স্থানের উপযুক্ত হইবে? অতএব দেবাসুরের সম্মিলিত বল ও নিষ্ঠা লইয়া শিক্ষালাভ ধর্ম্মচর্য্যা এবং জগতের প্রীতির কার্য্য কর। সেই কার্য্যে আজ যত বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করিলে, কাল তাহার দ্বিগুণ বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ কর, পরশ্ব তাহার চতুর্গুণ প্রয়োগ কর। এইরূপ দিন দিন বল ও নিষ্ঠা বাড়াইয়া যাও, তবে সিদ্ধ হইবে। তবে কল্পনাতীত বিশ্বমণ্ডলের কল্পনাতীত উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইবে। আজ পৃথিবীতে বিপুল চেষ্টায় বিপুল উন্নতি লাভ করিয়া বৃহস্পতি গ্রহে চলিয়া গেলে, কাল বৃহস্পতি গ্রহে আরো বিপুল চেষ্টায় আরো উন্নতি লাভ করিয়া বুধগ্রহে চলিয়া গেলে, এইরূপ উঠিতে উঠিতে এবং বাড়িতে বাড়িতে কোথায় চলিয়া গেলে এবং কি হইয়া গেলে আমি মর্ত্ত্যবাসী কেমন করিয়া তাহার ঠিকানা করিব? বুঝি বা সেই প্রাচীন অদ্বৈতবাদী মহাযোগীর ন্যায় শেষে সেই মহাশক্তির মহাপ্রাণে মিশিয়া অসীম শক্তি ধরিয়া অনন্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে! আমার পরলোকবাদ আমার পূর্ব্বপুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না। আমার পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র পদে কোটি কোটি প্রণাম!

এখন আর একবার জিজ্ঞাসা করি, পরলোক যে কেহ কখন দেখিল না, তাহা কি মানুষের দুরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট? উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই এ কথার মীমাংসা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরলোকের সহিত অনির্দ্দিষ্ট পরলোকের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট পরলোক অপেক্ষা

অনির্দ্দিষ্ট পরলোক মনুষ্য জাতির উন্নতির অনুকূল। এবং মনুষ্য জাতির ইতিহাস এবং প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও এই মহাতথ্যটি পাওয়া যায় যে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত নয় অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় প্রতীয়মান নয়, অথবা যাহা কল্পনার সহিত বেশী মিশ্ খায়, তাহা দ্বারা মনুষ্য জাতির যত উন্নতি হইয়াছে এবং হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় প্রতীয়মান অথবা যাহা কল্পনার সহিত মিশ খায় না, তাহা দ্বারা তত উন্নতি হয় নাই এবং হইতে পারে না। স্থপতিকার্য্য (Architecture) অপেক্ষা ভাস্করকার্য্যে (Sculpture) ideality বা কল্পনার বেশী সংযোগ হয় অর্থাৎ বেশী পরিমাণ থাকে। সেই জন্য স্থপতিকার্য্য অপেক্ষা ভাস্করকার্য্যের মনের উপর বেশী প্রভুত্ব। চিত্র অপেক্ষা কাব্যে ideality বেশী থাকে। সেই জন্য মনের উপর চিত্র অপেক্ষা কাব্যের বেশী প্রভুত্ব। অনেক বাঙ্গালির ঘরে দেবোপমা স্ত্রীরত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়ে সে সকল স্ত্রীর চরিত্র অনুসরণ না করিয়া, কল্পনাসম্ভূত কল্পনাময়ী সীতা সাবিত্রীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। কোলাহলময় সমৃদ্ধিশালীজীবন্ত রাজধানী অপেক্ষা মানুষ প্রাচীন রাজধানীর কালের-কালিমা-মিশ্রিত নিস্তব্ধ ভগ্নাবশেষে বেশী সুখ সম্পদ গৌরব ও মহত্ব দেখিয়া থাকে। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অতীত কাল মানুষের মনকে বেশী মুগ্ধ করে। দৃষ্টি অপেক্ষা স্মৃতি মানুষের বেশী মোহকর মন্ত্র। জীবন্ত সেক্সপীয়রকে কেহই জানিত না, কেহই মানিত না। কালগর্ভশায়ী সেক্সপীয়র মানসিক জগতের মহাদেব। মনুষ্যের উন্নতিশাস্ত্রের ইহা একটি প্রধান সূত্র। যাহাতে ideality নাই, তাহা মনুষ্যের উন্নতির কম অনুকূল। যাহাতে ideality আছে তাহা মানুষের উন্নতির বেশী*

---

* এখানে ideality এবং মনুষ্য জাতির উন্নতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তৎসম্বন্ধে এত গুলি কথা বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। কোন কোন খ্যাতনামা বাঙ্গালি গ্রন্থকার কাব্যে এবং উপন্যাসে ideal character-এর আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। আরো অনেকের সেই মত। তাঁহারা আমার কথা গুলি পড়িয়া সে আবশ্যকতা বুঝুন আর নাই বুঝুন, আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

অনুকূল। কেন এরূপ হয় এ প্রবন্ধ তাহা বুঝাইবার স্থান নয়। এ স্থলে কেবল মাত্র তথ্যটি মনে করা আবশ্যক। এবং মনে করিয়া বুঝা আবশ্যক যে আমি যে পরলোকবাদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে যত ideality আছে, পূর্ব্বকাল হইতে যে সকল পরলোকবাদ সাধারণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহার শতাংশের একাংশ ideality ও নাই। যদি মানব-প্রকৃতি এবং মনুষ্যের উন্নতি-প্রদ্ধতি কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি, তবে বোধ হয় সাহস করিয়া পাঠককে আমার পরলোকবাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি।

সম্পূর্ণ।